বাৎসরিক কলেজ পত্রিকা

বলাকা

২০২৩

গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয়

অমরকানন, বাঁকুড়া

Indian Red Cross Society
BANKURA DISTRICT
RED CROSS

GPS Map Camera
Maraya, West Bengal, India

CENTRAL LIBRARY
GPS Map Camera
Bankura, West Bengal, India
C443+VQ2 Gobinda Prasad College, West Bengal 722133, India
Google

NATIONAL SERVICE SCHEME

GPS Map Camera
Bankura, West Bengal, India
C443+VQ2 Gobinda Prasad College, West Bengal 722133, India
Lat 23.407013°
Long 87.104237°
14/08/23 01:19 PM GMT +05:30
Google

গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়

বাৎসরিক কলেজ পত্রিকা

বলাকা

২০২৩

অমরকানন ★ বাঁকুড়া

Members of the Governing body

1. Shri Hridaymadhab Dubey	President
2. Dr. Tushar Kanti Halder	Principal/Secretary
3. Dr. Rajeev Kr. Jha	Govt. Nominee
4.Prof. Prakash Kanti Nayek	Govt. Nominee
5. Dr. Arunabha Chattopadhyay	Nominee of W.B.S.C.H.E
6. Dr. Shaikh Sirajuddin	Bankura University Nominee
7. Dr. Suchitra Mitra	Bankura University Nominee
8. Prof. Parimal Saren	Teachers' Representative
9. Dr. Sathi Mukherjee	Teachers' Representative
10. Dr. Sumit Kumar Mondal	Bursar

- **প্রকাশক**– অধ্যক্ষ, গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়
- **প্রকাশ কাল** সোমবার, ৬ই মার্চ ২০২৩
- **পত্রিকা শিক্ষক সম্পাদক**– ড. তাপস মন্ডল
- **পত্রিকা শিক্ষক সহ-সম্পাদক** – বিবেকানন্দ সিংহ

Teaching Staff

Principal : Dr. Tushar Kanti Haldar. *M.A., Ph.D.*

Bengali Dept. : Dr. Tapas Kumar Mondal *M.A., Ph.D. (H.O.D.)* Asst. Professor
: Prof. Debanjana Karmakar, *M.A.(SACT-II)*

English Dept. : Prof. Parimal Saren, M.A. *(H.O.D.)*Asst. Professor
: Prof. Sweety Roy (Rajguru), *M.A.* M.Phil. Asst. Professor
: Prof. Sarbani Bera, *M.A.* Asst. Professor
: : Prof. Satabdi Roy, *M.A. (SACT-I)*
: : Prof. Medha Misra, *M.A. (SACT-II)*

History Dept. : Prof. Runu Ghosh, *M.A. (H.O.D.)* Asst. Professor
: Dr. Sumit Kumar Mondal *M.A., Ph.D.* Asst. Professor
: Prof. Bibekananda Sinha, *M.A.,(SACT-II)*

Philosophy Dept. : Prof. Amit Koley *M.A.,M. Phil.,(H.O.D.)* Asst. Professor
: Prof. Gargi Banerjee *M.A.(SACT-II)*

Mathematics Dept. : Dr. Sathi Mukherjee, M.Sc. Ph .D. *(H.O.D.)* Asst. Professor

Geography Dept. : Prof. Biswajit Talukdar M.Sc. *(H.O.D.)* Asst. Professor
: Prof. Pavel Sarkar, *M.A. (SACT-II)*
: Prof. Moumita Gorai, *M.A..(SACT-I)*
: Prof. Sumit Sen Modak, *M.A.(SACT-I)*

Sanskrit Dept. : Prof. Sourav Dey *M.A.(SACT-I) Dept.-in-charge*
: Prof. Chandan Pai *M.A.,(SACT-I)*
: : Prof. Suprava Dey Kundu *M.A.,(SACT-II)*

Pol. Science Dept. : Prof. Abbasuddin Mondal *M.A. (SACT-I)*

Phy. Education Dept. : Prof. Arghya Nayak *M.P.Ed. (SACT-II) Dept.-in-charge*

Education Dept. : Prof. Sanatan Sahoo *M.A. (SACT-I) Dept.-in-charge*
: : Prof. Bristi Mondal *M.A. (SACT-II)*

Economics Dept. : Vacant

Office Staff

1. Head Clerk (Vacant)	: Sri Bhabani Sankar Nayak
2. Accountant	: Vacant
3. Cashier	: Vacant
4. Clerk	: Vacant
5. Office-bearer (Vacant)	: Sri Susanta Kanta Sinha, B.A.(Casual)
6. Sweeper	: Sri Paritosh Bouri
7. Night Watchman	: Vacant
8. Darwan	: Vacant
9. Librarian (Vacant)	: Bappaditya Nag Modak (Casual)
10. Office Staff	: Lakshmi Kanta Sinha, B.A.(casual)
11. Office Staff	: Priyanka Roy Dip. Engr.(casual)
12. Office Staff	: Animesh Debnath (casual)

সূচীপত্র

অধ্যক্ষের প্রতিবেদন		৭
From the Desk of Coordinator, IQAC		৮
পত্রিকা সম্পাদকের কলমে		৯
কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতির প্রতিবেদন		১০

অধ্যাপক/অধ্যাপিকার রচনা

❒ প্রবন্ধ

তত্ত্বালোচনায় মানবাধিকার	অমিত কোলে	১১
ভারতীয় শিক্ষার বিবর্তন	সনাতন সাহু	১৬
মুর্শিদাবাদের কারুশিল্প	ড. সুমিত কুমার মন্ডল	২০
সামাজিক পরিসরে নারীর ভূমিকা ও অংশগ্রহণ	আব্বাসউদ্দিন মন্ডল	২৩
উত্তরের হাওয়ায় ফেলে আসা স্মৃতিরা	গার্গী ব্যানার্জ্জী	২৬
দেবতাতত্ত্বের পর্যালোচনা	ড. চন্দন পই	২৭
সংস্কৃত সাহিত্যে শরৎঋতুর সৌন্দর্যতা	সুপ্রভা দে কুন্ডু	৩০
বর্তমান যুগের খেলাধুলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	অর্ঘ্য নায়ক	৩৩
বিষ্ণুপুরের রক্তাক্ত ইতিহাস ও লালবাঈ	বিবেকানন্দ সিংহ	৩৫
বাঁকুড়ার লোকজীবনে শিক্ষার ভূমিকা	ড· তাপস মন্ডল	৩৮
শুশুনিয়া- পখন্না ঃ ইতিহাসের গতিধারা	রুনু ঘোষ	৪১
ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে দেশাত্মবোধ	দেবাঙ্গনা কর্মকার	৪৯
ভারতের উপজাতিদের জীবন গাথা	মৌমিতা গরাই	৫৩

❒ **Essay**

Effects of COVID-19 on India's Education System	Dr. Sathi Mukherjee	৪৫
নিজস্বতা (কবিতা)	বৃষ্টি মন্ডল	৫৬

শিক্ষাকর্মীর রচনা

❒ কবিতা

সংকেত	ভবানী শঙ্কর নায়ক	৫৬

❒ প্রবন্ধ

বাঁচতে হলে খেলতে হবে	সুশান্ত সিংহ	৪৪

সূচিপত্র-২

ছাত্রছাত্রীদের রচনা

❐ গল্প

সেই আশ্চর্য বৃষ্টির রাত	অদিতি দাস	৫৭
কালুয়া ডোমের জীবন কাহিনি	গনেশ বাদ্যকর	৬৫

❐ প্রবন্ধ

কাজের মূল্য	পল্লবী নায়ক	৬০
নৃত্য	সপ্তমী সিংহ	৬৩
Clarity of Thoughts in Human Life	Arnab Pal	৬৭

❐ কবিতা

প্রভাতবেলা	সোমনাথ গরাই	৫৮
গাছের ধর্ম	লক্ষ্মী গরাই	৫৮
জ্ঞানের লাইব্রেরি	পূজা দাস	৫৯
বন্ধু	প্রিয়া হালদার	৫৯
রাঁড়দঃ সাঁওত্বঃ আঁরি সিরিঞ	নীলিমা হেম্বরম	৫৯
স্বপ্ন	সোনালী কর্মকার	৫৯
আমার মহাবিদ্যালয়	অমর্ত্য মন্ডল	৬১
আমাদের ছোটবেলা	আনন্দ ভট্টাচার্য্য	৬১
মা	রিয়া ঘোষ	৬২
আধুনিকতা	সহেলী রায়	৬২

অধ্যক্ষের প্রতিবেদন

শাল পলাশের সবুজ পাতার মর্মর ধ্বনি, দেবদারু আর অশোকের ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়, লাল কাঁকরের বুক চিরে বয়ে চলা ছোট্ট শালী নদীর স্রোতধারা আর কোঁড়ো পাহাড়ের হৃদয় মাঝে একটি ছোট্ট জনপদ অমরকানন। মহাত্মা গান্ধী, নজরুলের পদধূলি বিজড়িত গোবিন্দ প্রসাদ সিংহের কীর্তিভূমি এই অমরকাননেই উচ্চ শিক্ষার বহমান ধারাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, গোবিন্দ প্রসাদ সিংহের নামাঙ্কিত এই মহাবিদ্যালয়। উত্তর বাঁকুড়ায় পিছিয়ে পড়া বহু গ্রামের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে তৎকালীন রামকৃষ্ণ সেবাদল আশ্রমের ১৯ একর ৪২ শতক দানের জমিতে গড়ে ওঠা আজকের এই নব কলেবর মহাবিদ্যালয়টি।

এতদ্ অঞ্চলে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগ (U.G.C), রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান (R.U.S.A), পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তায় গোবিন্দ প্রসাদ সিংহের নামাঙ্কিত এই মহাবিদ্যালয়টির দিন দিন যে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে চলেছে তা অনস্বীকার্য।

বাঁকুড়া জেলার শিক্ষার মানচিত্রে গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়ের শুধু কলেবর বৃদ্ধি হয়নি, গুণগত উৎকর্ষেও সে আজ মহীরুহে পরিণত। তবে আত্মতৃপ্তির জায়গা নেই, আগামীতে আরও বৃহৎ ও মহতের জগতে মহাবিদ্যালয়টি নিজের স্বকীয়তাকে ধরে রাখতে বদ্ধ পরিকর। যেমন- পঠন পাঠনের অনুকূল পরিবেশ, ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়ক দাবি দাওয়াকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা, প্রযুক্তিগুনে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে মহাবিদ্যালয় নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয় শুধুমাত্র ধরাবাঁধা প্রথাগত শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত করে না, সমাজের প্রতিও যে ছাত্র-ছাত্রীদের দায়বদ্ধতা আছে সে সম্পর্কেও তাদেরকে সামাজিক মূল্যবোধের পাঠ দেয়। তারই ফলস্বরূপ মহাবিদ্যালয় থেকে দুটি জনমুখী প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, প্রথমটি 'আনন্দম'- যার লক্ষ্য হলো এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ে। সেই উদ্দেশ্যেই প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কলেজে নিয়ে এসে উচ্চশিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদের মনে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন জাগানো। অন্যটি 'আরোগ্যম'- যার লক্ষ্য এলাকার দুঃস্থ মহিলা এবং শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এ বিষয়ে মহিলাদের যে লজ্জা, তার বাইরে বেরিয়ে এসে তাদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করা। এছাড়া মহাবিদ্যালয়ে একটি অবৈতনিক সেলাই শিক্ষন বিভাগ আছে যার মাধ্যমে এলাকার মহিলাদের স্বাবলম্বী করার একটি প্রচেষ্টা করা হয়। আগামী দিনে কলেজ আরও জনমুখী প্রকল্পের বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হবে।

অধ্যক্ষ হিসাবে এই মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে আমি গর্বিত। কলেজের সামগ্রিক উন্নয়নে কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি ও অন্যান্য সভ্যবৃন্দ, অভিভাবক-অভিভাবিকাগন, এলাকার সুধী ব্যক্তিবর্গ, কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীসহ সকল ছাত্র-ছাত্রীরা যেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। আমার বিশ্বাস এই মহাবিদ্যালয়ের সুযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষার জগতে নিজেদের স্থানটিকে যেমন চিহ্নিত করবে, তেমনি ভবিষ্যৎ জীবনেও হবে সু-সভ্য নাগরিক। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল কলেজের বার্ষিক পত্রিকা 'বলাকা' সংশ্লিষ্ট সকল ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী, সর্বস্তরের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গ ও এলাকাবাসীকে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ড. তুষার কান্তি হালদার

অধ্যক্ষ, গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়

From the Desk of Coordinator, IQAC

Nestled in a picturesque, rural setting of Amarkanan in G.Ghati Block, Gobinda Prasad Mahavidyalaya unfurled its wings in 1985. The college is named after the great patriot, the philosopher, social reformer Rishi Gobinda Prasad Singha. The renowned freedom fighter Gobinda Prasad Singha endeavored to set up a higher educational institute in the remotest part of the Bankura District so that the students can avail adequate facilities. The College was established in 1985 and was affiliated by the University of Burdwan on 20-09-1985 on temporary basis and later on 30-08-1988 on substantive basis in order to extend higher education in the most backward areas of the district. It came under the affiliation of Bankura University on and from 01.01.2017. Considering the remote location of the college and the first generation learner, the college had been taking many initiatives for the students. The IQAC was formed on 20.08.2014 and is functioning effectively to develop several quality assurance mechanisms within the existing academic and administrative system. The college was awarded B+ in the first cycle of NAAC. Now the college is preparing for the 2nd cycle. Though limited in number and resources, yet is infinite in aspirations. The small family that we are of, we look forward to construct such holistic academic arena within the college campus so that we can promote excellence in Higher Education, empowerment through knowledge, radical growth in socio-economic aspect and sustainable development in academic fields. The College signed a MoU with The Wollongong University of Australia to exchange and enrich the academic excellence. The College is striving hard to extract the highest returns in terms of producing fruitful results with the existing faculty members and resources. We have already ushered into the world of e-governance in all academic and administrative activities of the college. Now, our college magazine BALAKA will be published by my dear students, colleagues, and well-wishers of the institution. I'm giddy with excitement. I express my gratitude to the Magazine Committee and all those involved in its publication, whether directly or indirectly. I sincerely hope that BALAKA is a huge success.

Prof. Parimal Saren

Coordinator, **IQAC**

পত্রিকা সম্পাদকের কলমে–

"চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি"

'শিক্ষার হেরফের'র প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একথা বলেছেন। এখানেই তিনি শিক্ষার যথার্থ স্বরূপ তুলে ধরেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন আমাদের বর্তমান শিক্ষার অবস্থা। বেশির ভাগ মানুষ যে শিক্ষা গ্রহন করে তা শুধু অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে। এতে তাদের আত্মিক উন্নতি হয় না। শুধু তাদের জীবনটা পাঠ্য বইয়ের আড়ালে ঢেকে যায়। সাহিত্যের রস সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা জন্মানোর সুযোগ পায় না। কারণ এদেশে সকল কিছুর চর্চা গ্রহণযোগ্য কিন্তু সাহিত্যচর্চা গ্রহণযোগ্য নয় বরং সময় অপচয় বলে মনে করে থাকে । ফলে আমাদের নীরস শিক্ষায় জীবন সেই মহেন্দ্রক্ষন অতীত হয়ে যায়। আমরা বাল্য থেকে কিশোর এবং কিশোর থেকে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতগুলো কথার বোঝা টেনে। এতে করে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয় না।

কলেজ পত্রিকার জন্য লেখা সংগ্রহ করতে গিয়ে এসব কথা বলতে হচ্ছে। কারণ ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সাহিত্য-মাধ্যমে বিনোদন তথা শিল্পোচর্চা লক্ষনীয়ভাবে কমে গেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের-নিজস্ব পত্রিকায় বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের অংশগ্রহন কম। এটা নিঃসন্দেহে খারাপ লক্ষন। জানি না এর কোন প্রয়োজন আছে কিনা ! তবে যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা লেখা দিয়েছে, তাতেই এই পত্রিকা সমৃদ্ধ। বারবার তাগাদা দিয়ে তাদের কাছ থেকে যে কবিতা ও গদ্যধর্মী প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি পাওয়া গেছে, সেগুলি যথাসম্ভব এই পত্রিকায় রূপায়িত হয়েছে। তবে এটুকু বলতে পারি, আকারে তুলনামূলক ছোট হলেও পত্রিকার লেখাগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ের স্বাদ পাওয়া যাবে। তাছাড়া কিশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পন করা ছেলেমেয়েদের লেখাগুলোতে নানাবিধ চিন্তা-চেতনার ছাপও বর্তমান। অনেক লেখাতেই তাদের সংবেদনশীল মনের পরিচয় পরিস্ফুট। সেই সঙ্গে লেখক তালিকায় এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক /অধ্যাপিকা এবং শিক্ষা কর্মীবৃন্দদের নামও যুক্ত আছে। তাদেরও মননশীল রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটি। সমস্ত লেখকদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সহায়তার হাত ধরেই পত্রিকাটির প্রকাশ। এজন্য অধ্যাপক /অধ্যাপিকা ও শিক্ষা কর্মীবৃন্দ এবং নবীন- প্রবীন ছাত্র-ছাত্রীদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা, নমস্কার, প্রীতি ও শুভেচ্ছা এবং অসংখ্য ধন্যবাদ।

আমাদের এই প্রচেষ্টার সুযোগ আমরা পেয়েছি মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যে। তাই প্রথমেই মহাবিদ্যালয়ের কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি মাননীয় হৃদয়মাধব দুবে এবং মাননীয় অধ্যক্ষ ড. তুষার কান্তি হালদার মহাশয়কে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা, নমস্কার, ও সুগভীর কৃতজ্ঞতা। তাদের সাহায্য ছাড়া এই পত্রিকাটি প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব হতো না। তিনি অভিভাবকের মতো উৎসাহ ও পরামর্শ দান করেছেন। কাজটা যে সহজেই করা যায় এই বিশ্বাস সঞ্চার করেছেন তিনি। সবশেষে এই পত্রিকার কোনো একটি রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আগামীতে কোনো একটি ছাত্র-ছাত্রী উৎসাহিত হলে কিংবা তাদের মধ্যে সাহিত্য মাধ্যমে সুস্থ বিনোদন চর্চার প্রসার ঘটলে সার্থক হবে এই আয়োজন।

ড. তাপস মন্ডল,

পত্রিকা সম্পাদক , সহকারী অধ্যাপক বিভাগীয় প্রধান ,বাংলা বিভাগ গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়

বি.দ্র. -পত্রিকায় প্রকাশিত সমূহ বিষয় স্রষ্টার নিজস্ব চিন্তাভাবনা প্রসূত । এর কোন অংশের জন্য প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট কেউই দায়বদ্ধ নয়। লেখা প্রকাশের নিয়মাবলী অনুসৃত হয়। কেবলমাত্র স্বমননজাত, প্রথম প্রকাশযোগ্য মৌলিক রচনাই আহ্বান করা হয়। মুদ্রণ প্রমাদ মার্জনীয়।

কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতির প্রতিবেদন

বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামী গোবিন্দ প্রসাদ সিংহের নামাঙ্কিত গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা "বলাকা" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত হলাম। কারণ এই সাহিত্য পত্রিকার মাধ্যমেই কলেজের নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের নূতন নূতন চিন্তাভাবনার ফসল ফলবে এবং তা খুবই আনন্দের, কারণ বর্তমানের ছাত্র-ছাত্রীরাই ভবিষ্যত সমাজের ধারক ও বাহক।

গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু ১৯৮৫ সাল থেকে। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় কলেজটি দিনে দিনে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। আগামী দিনে শিক্ষার মানচিত্রে যে মহাবিদ্যালয়টি নিজের আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আজকের এই মহাবিদ্যালয়ের পরিবেশ, পরিকাঠামো, পঠন-পাঠন, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক সবই শিক্ষার মান উৎকর্ষের সহায়ক। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে এই সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলির মাধ্যমে। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, বিবেকানন্দ মেরিটকাম স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড- বর্তমানের কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাঙ্গনে নতুন উদ্যমে যোগদানের যে জোয়ার এনেছে তা অনস্বীকার্য। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সহযোগিতা এবং নানাস্তরের শুভাকাঙ্ক্ষীদের বদান্যতায় কলেজের শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নির্মাণ, অভিনব সাংস্কৃতিক মুক্তমঞ্চ নির্মাণ, ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের জন্য উন্নত ক্যান্টিন নির্মাণ, পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা, এছাড়া অত্যাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো উন্নততর করার প্রয়াস প্রশংসার দাবী রাখে। গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয় দীর্ঘকালীন জমি জট সমস্যায় জর্জরিত ছিল, ফলে ইচ্ছে থাকলেও কলেজের কলেবর বৃদ্ধির কোন উপায় ছিল না । বর্তমানে বহু নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই জমি জটকে কিছুটা হলেও সমাধান করতে পেরেছি । আশা রাখি ভবিষ্যতেও এলাকার শুভানুধ্যায়ী ও জমি দাতাগণের উত্তরসূরীদের সাহায্য ও সহযোগিতায় কলেজের জমি সমস্যার পূর্ণ সমাধান ঘটবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অধ্যক্ষ মহাশয়ের নেতৃত্বে কলেজের অধ্যাপক- অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীরা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্বেও যেভাবে মহাবিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তার জন্য কোন প্রশংসা যথেষ্ট নয়। 'বলাকা' পত্রিকা প্রকাশে যেসব অধ্যাপক- অধ্যাপিকা, শিক্ষা কর্মী ছাত্র-ছাত্রী নিরলস পরিশ্রম করেছে তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

হৃদয়মাধব দুবে
সভাপতি ,কলেজ পরিচালন সমিতি
গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয়

প্রবন্ধ

তত্ত্বালোচনায় মানবাধিকার

অমিত কোলে

সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, দর্শন বিভাগ

আজকাল প্রায়শই বাসে, ট্রামে, ট্রেনে, সোশ্যাল মিডিয়া,সংবাদপত্রে সর্বত্রই একটা কথা আমাদের কানে ভেসে ওঠে তা হল- মানবাধিকার লঙ্ঘনের খবরাখবর। সাম্প্রতিককালে যাকে মানবাধিকার বা *Human Rights* বলা হয়, তার মধ্যে দিয়ে সকল মানুষের অধিকার রক্ষার দাবিটি একটি নৈতিক দাবীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তা ক্রমশই মানুষের আইনগত আধিকারে পরিণত হয়েছে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সমস্ত যুগেই মানুষের মর্যাদা উপেক্ষিত হয়েছে এমনকি আধুনিক যুগেও তার ব্যাতিক্রম ঘটেনি। তবে তৎকালীন সময়ে যাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে উল্লেখ করা হয়েছিল সেখানেও প্রত্যেক মানুষের সমানাধিকারের উল্লেখ ছিল। আর সভ্যসমাজে মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য নানাবিধ আইন প্রনয়ন করা হয়েছে। যেমন ইংল্যান্ডে ১২১৫ খ্রীঃ *'Magna carta'*, ১৬২৮ খ্রীঃ *'The Petition of Right'* এবং ১৬৮৯ খ্রীঃ *'Bill of Right'* মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্যই প্রণিত হয়েছিল। এমনকি উনবিংশ শতাব্দীতেও বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র আইনের দ্বারা মানবাধিকার সংরক্ষণের চেষ্টা করেছেন। ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রসংঘ সিদ্ধান্ত নেয় যে, প্রতিবছর ১০ ই ডিসেম্বর তারিখটি মানবাধিকার দিবস হিসেবে উৎযাপিত হবে।[১]

এখন প্রশ্ন হল: মানবাধিকার বলতে আসলে কী বোঝায় ? অর্থাৎ মানবাধিকার কথাটির অর্থ কী ? একথার অর্থ বুঝতে হলে প্রথমেই আমাদের স্মরণে রাখা দরকার যে, সমস্ত মানুষই জন্মসূত্রে সমান মর্যাদা ও অধিকার সম্পন্ন। মানুষের এই সমমর্যাদা ও সমঅধিকারের দাবিটি একটি নৈতিক দাবি। মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেই এই নৈতিক দাবি করতে পারে। এই নৈতিক দাবি 'মানবিক অধিকার' নামে প্রকাশিত হয়েছে এবং কালক্রমে আইনসঙ্গত অধিকারের রূপ পেয়েছে। এককথায় মানবাধিকার বলতে সব মানুষের প্রাপ্য অধিকারকে বোঝায়। মানবাধিকার হল এমন এক ধরনের মৌলিক অধিকার যেখানে স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি অর্জন, ধর্ম-কর্ম পালনের সুযোগসহ মানুষের শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধাভোগের অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়। এসমস্ত অধিকার বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে বলবৎ করতে রাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে।

কাজেই কোনো কোনো অধিকার সামর্থ্য বা ক্ষমতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এইসব অধিকার মানুষকেই অর্জন করতে হবে। এই অধিকার মানুষের জন্মের পর থেকে অর্জিত হয় তাই এই জাতীয় অধিকারকে অনেকেই 'জন্মগত' অধিকার বলে অভিহিত করেছেন। এই জাতীয় অধিকার 'জন্মগত' কেননা প্রাতিটি মানুষ বংশ, জাতি, লিঙ্গ এবং ধর্মনিরপেক্ষভাবে এই অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। এই জাতীয় অধিকারকে মানুষের অধিকার বা মানবাধিকার বলা হয়। যদি কোনো অধিকারকে মানবাধিকার। রিচার্ড ওয়াসার স্ট্রম্ *(Richad wasser strom)* এর মতানুসারে, কোনো অধিকারের সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত হলেই তাকে মানবাধিকার বলে গণ্য করা যাবে।[২]

তিনি মানবাধিকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টের উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

i) মানবাধিকার হল সকল মানুষের সাধারণ অধিকার এবং কেবলমাত্র মানুষেরই অধিকার।

ii) দেশকাল নির্বিশেষে সব মানুষ অধিকারটি সমানভাবে ভোগ করে।

iii) মানবাধিকারের ক্ষেত্রে কোনো ক্রমোচ্চ পর্যায় নেই। সকল মানুষের ক্ষেত্রেই মানবাধিকার সমান ভাবে প্রযোজ্য হবে না।

iv) পদমর্যদা বা প্রতিষ্ঠার ওপর নির্ভরশীল না হওয়ায় মানবাধিকার অপরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর, সম্মতি-অসম্মতির উপর নির্ভরশীল নয়। অপরের ইচ্ছা ও সম্মতির বিরুদ্ধেও মানবাধিকারের প্রতি প্রত্যেক মানুষের দাবী চূড়ান্ত বা সার্বভৌম। মানবাধিকার হল জন্মগত স্বাভাবিক অধিকার। মানবাধিকার যেহেতু অর্জিত অধিকার নয়, যেহেতু এই অধিকার জন্মসূত্রে পাওয়া তাই এই অধিকার মানুষের জন্মগত দাবী। কারো কৃপায় বা মধ্যস্থতায় মানুষ এই অধিকার অর্জন করে না। এজন্যই কারো পক্ষে কোনো মানুষকেই এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা সম্ভব নয়। সমগ্র বিশ্বও যদি এই অধিকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় তাহলেও এই অধিকার থেকে কোনো মানুষকে বঞ্চিত করা সম্ভব নয়। মানবাধিকার যেহেতু মানুষের জন্মগত অধিকার তাই সমস্ত মানুষ সর্বদা এই অধিকার ভোগ করে থাকে। জন্মগত অধিকার কখনও মানুষকে পরিত্যাগ করে না।[৩]

এখন প্রশ্ন হল অধিকার বলতে আসলে কী বোঝায় ? অধিকার হল আমাদের নৈতিক দাবির ভিত্তি। যে বিষয়ে আমার অধিকার থাকে সেই বিষয়কে আমি নৈতিক ভাবে দাবি করতে পারি। আমার অধিকার ভোগ করার জন্য আমি কারো মুখাপেক্ষী হই না। অধিকারের ভিত্তিতে আমি যে কাজ করি তার জন্য কারো অনুমতির প্রয়োজন হয় না। আমার অধিকারই আমার কাজের নৈতিক সমর্থন জোগায়। অধিকারের ভিত্তিতে যে কাজ করা হয় তা হল নৈতিক কাজ। আমরা যদি মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি তাহলে মানবাধিকারকেও স্বীকৃতি দিতে হবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রথম অনুছেদে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকটি মানুষ জন্মসূত্রে স্বাধীন মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে। তাই জন্মসূত্রে প্রতিটি মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সমান। মানবাধিকারের প্রথম কথায় হল এই যে, প্রত্যেক মানুষের জীবনধারণের অধিকার আছে, স্বাধীনতার অধিকার আছে এবং নিরাপত্তার অধিকার আছে। তাই কোনো মানুষকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় না। জাতিপুঞ্জের ঘোষণার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, এই অধিকার মানুষে মানুষে কোনো বৈষম্য স্বীকার করে না। মানুষের মধ্যে কোনো জাতি, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রভৃতির দিক থেকে বৈষম্য রয়েছে। তবে এইসব বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করা হয়। কাজেই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষ স্বাধীন। বিভিন্ন দার্শনিক প্রবন্ধে মানবাধিকার সম্বন্ধে ইতিবাচক অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে; অর্থাৎ দার্শনিকরাও স্বীকার করেছেন যে, সকল মানুষ সমান এর ফলে সকল মানুষ সমানভাবে কিছু কিছু অধিকার ভোগ করে থাকে। গ্রেগরি ভ্লাস্তোস *'Justice and Equality'* প্রবন্ধে প্রতিটি মানুষের দুটি মৌলিক অধিকারের কথা বলেছেন। যথা ঃ i) প্রতিটি মানুষের মঙ্গলের অধিকার এবং, ii) প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতার অধিকার।[৪]

প্রত্যেক মানুষেরই সুস্থ ও সুন্দর জীবনধারনের অধিকার আছে। একজন মানুষ শুধু মানুষ হিসেবে এই অধিকার দাবী করতে পারে। মানুষে মানুষে যতরকম বিভেদ থাকুক না কেন এই অধিকার সকলেই সমানভাবে ভোগ করতে পারে। একজন ধনী ব্যক্তির জীবনযাপনের যতটুকু অধিকার আছে ; অপর একজন দ্ররিদ্র ব্যক্তিরও ঠিক ততটাই অধিকার আছে। আমরা যদি মানুষের মঙ্গলের কথা চিন্তা করি তাহলে সব মানুষের মঙ্গলই আমাদের বিবেচনা করতে হবে। মঙ্গলের অধিকার মানুষ জন্মসূত্রেই লাভ করে। আবার স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। মানুষ জন্মসূত্রে স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে তাই সে জন্মগতভাবে স্বাধীন। এই স্বাধীনতা তাকে কেউ অনুগ্রহ করে দান করেননি। স্বাধীনতা হল তার স্বাভাবিক অধিকার। এই স্বাধীনতা তার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশিত হতে

পারে। এখানে ব্যক্তি-মানুষের নিজস্ব মতপ্রকাশের অধিকার হল সবচেয়ে মৌলিক অধিকার। এই অধিকার বলে মানুষ নিজেই নিজের জীবনধারাকে নির্বাচন করে তার নিজস্ব মূল্যবোধকে গঠন করে। তাছাড়া জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা বিকল্পের মধ্য থেকে কোনো একটিকে বেছে নেওয়ার মধ্যে মানুষ তার স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণায় এবং দার্শনিকের চিন্তাধারায় যে বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে তা হল- একজায়গায় সমস্ত মানুষই সমান। এই সমতা হল মানুষ হিসেবে মর্যাদার সমতা। তাই আমরা বিশাস করি যে, একজন শ্বেতাঙ্গ এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ সমান মূল্য বা মর্যাদার অধিকারী। একজন ধনী ব্যক্তির যতটা মঙ্গল বা স্বাধীনতার অধিকার আছে ততটা একজন দরিদ্রে ও ঠিক ততটাই অধিকার আছে।

একইভাবে, আমরা এটা অনুভব করি যে কোন ব্যক্তির ইচ্ছা, বিশ্বাস, তার অনুমোদন, সমর্থন, আরাধনা ইত্যাদি যেমন স্বকীয় মূল্যে মূল্যবান তেমনই অন্যকোনো ব্যাক্তির ইছা, বিশ্বাস ইত্যাদিও স্বতঃমূল্যবান। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কাছে প্রত্যাশা হল এই যে, ইচ্ছা, বিশ্বাস অনুমোদন ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের যেন সমান স্বাধীনতা থাকে। কাজেই একথা স্বীকার করতে হয় যে, একজন ব্যাক্তির আত্মবিকাশের স্বাধীনতা অপর ব্যক্তির স্বাধীনতার মতই মূল্যবান। কেননা আমরা বিশ্বাস করি যে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বাধীনতা সকল মানুষের কাছে সমান মূল্যবান। সুখ-স্বাচ্ছন্দ এবং স্বাধীনতার প্রতি সব মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। কাজেই যদি কোনো ব্যাক্তির সুখ-স্বাচ্ছান্দ ও স্বাধীনতার অধিকার থাকে এবং যদি তাদের উপভোগ সবার কছে সমান মূল্যবান হয় তাহলে ওই সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও স্বাধীনতা লাভ করা, আয়ত্তে রাখা এবং উপভোগ করা হবে মানবাধিকার আর ওই অধিকার থেকে কোনো ব্যাক্তিকে বঞ্চিত করা হবে অনৈতিক কাজ। তবে মানবাধিকার সম্পর্কে শুধু সামাজিক স্বীকৃতি শেষ কথা নয়। যে সমাজ মানবাধিকারকে স্বীকার করে সেই সমাজেই হয়ত কার্যক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করে না। মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে সেই অধিকারকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে। তাই মানবাধিকারের সংরক্ষণের জন্য স্বীকৃতি এবং প্রয়োগ উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যে সমাজ শ্রেষ্ঠ অধিকারকে স্বীকার করে এবং সক্রিয় ভাবে সংরক্ষণের চেষ্টা করে, যে সমাজে মানবাধিকার শুধু তাত্ত্বিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে সেখানে যদি কার্যক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা রুদ্ধ হয় তাহলে সেই সমাজে মানবাধিকার নামে মূল্যবোধটি আছে একথা বলা যাবে না। তাই আমরা এমন একটি সমাজে বসবাস করতে চাইব যা নৈতিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আদর্শনিষ্ঠ। কেবল এই রকম সমাজেই মানবিক অধিকার সংরক্ষিত হতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে মানবাধিকারের একটি অন্যতম শর্ত হল ন্যায়বিচার। কেননা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হলে মানবাধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই মানবাধিকারের সঙ্গে ন্যায়বিচারের যে একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কাজেই মানবাধিকারের সঙ্গে ন্যায়বিচারের সম্পর্ক আলোচনার পূর্বে ন্যায়বিচার বলতে আসলে কী বোঝায় সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। আক্ষরিক অর্থে সামাজিক ন্যায়বিচার হল নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়নতা। অধ্যাপক বার্কারের মতে, ন্যায়বিচার হল স্বাধীনতা, সমতা ও মৈত্রীর বিশ্লেষণ।[৬] ন্যায়বিচার তখনই প্রতিষ্ঠা পায় যখন স্বাধীনতা কাম্য হয় এবং সকলে তা সমানভাবে উপভোগ করতে পারে। ন্যায়বিচারে কোনো মানুষের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা স্বীকৃত হয় না। কোনোপ্রকার অসম বন্টন সমর্থিত হয় না। তাত্ত্বিক দিক থেকে যদি একথা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, প্রত্যেক মানুষ সমান তবুও বাস্তবে তাদের আশা প্রত্যাশা ও চাহিদা সমান নয়। সুতরাং মানুষের চাহিদা ও প্রত্যাশার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সম্পদের বন্টন সামাজিক সমতা বিধানের জন্য অত্যাবশ্যক। জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর 'ইউটিলিটারিয়ালিজম্' নামক গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে ন্যায়পরায়ণতা তত্ত্বটি আলোচনা করেছেন। মিলের মতে, উপযোগীতাবাদ হল মানুষের আচরণের ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত বিচারের একমাত্র মানদন্ড।[১] উপযোগিতাবাদ মানুষের আচরনের একমাত্র

মানদন্ড হলেও ন্যায়পরায়নতার সঙ্গে উপযোগবাদের একটি নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। দার্শনিক হিউমের মতো মিলও বিশ্বাস করেন যে, ন্যায়পরায়ণতার ধারণাটি হল এমন একধরণের অনুভূতি ও প্রবণতা যা মানবজাতির দুটি মৌলিক স্বভাবজাত। এই দুটি মৌলিক স্বভাবের একটি হল আঘাতকারীকে শাস্তিদানের বাসনা এবং অপরটি হল এক ব্যাক্তির দ্বারা অপর ব্যাক্তির ক্ষতিসাধনে বিশ্বাস করা। ক্ষতিগ্রস্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত ব্যাক্তিকে শাস্তিপ্রদানের ইচ্ছা দুটি কারণে দেখা দেয়। একটি হল আত্মরক্ষার প্রবনতা আর অপরটি হল সহৃদয় অনুভূতি। এইসব অনুভূতিগুলি তখনই নৈতিক বলে গণ্য হবে যখন সমাজের সাধারণ মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য এই সমস্ত অনুভূতিগুলি কাজ করবে। উপযোগবাদ অনুযায়ী ন্যায়পরায়ণতা এবং ব্যাক্তিস্বাধীনতার ধারণা যখন সামাজিক কল্যানের উপায় হিসাবে গণ্য হয় তখনই তা সকলের নিকট নৈতিক বলে গণ্য হতে পারে। কাজেই উপযোগবাদের মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের সমষ্টিগত সুখ-শান্তি ও উপযোগীতা বৃদ্ধি করা। আর ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ হল নৈতিক নিয়ম মেনে চলা। সুতরাং ন্যায়পরায়ণতা তত্ত্বটি উপযোগবাদী নীতিতত্ত্বের পরিণতিস্বরূপ একথা বলাবাহুল্য।

মানুষের স্বার্থরক্ষা ও উন্নয়নের সঙ্গে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের ধারণা যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একথা কোনোভাবে অস্বীকার করা যায় না। তবে মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও ব্যবহারিক দিক থেকে উভয়েরই মধ্যে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

প্রথমতঃ মানবাধিকার হল এমন একধরনের মৌলিক অধিকার যেখানে স্বাধীনতা, ব্যক্তিনিরাপত্তা, সমৃদ্ধি অর্জন, শিক্ষাদীক্ষা, চিকিৎসা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধাভোগের অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়। এই সমস্ত অধিকার বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে বলবৎ করতে রাষ্ট্র দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

অপরদিকে ন্যায়বিচার একটি নৈতিক আদর্শগত ধারণা যেখানে সমাজের সকল সদস্যের একইরকম মৌলিক অধিকার, সুযোগ সুবিধা স্বীকৃত হয়।

দ্বিতীয়তঃ সামাজিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির বাধ্যবাধকতার ধারণার সাথে মানবাধিকারের ধারনাটি সম্পর্কযুক্ত। পক্ষান্তরে, সামাজিক ন্যায়বিচার সমাজে বসবাসকারী সকল মানুষের স্বার্থ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার নীতি অনুসরণ করে।

তৃতীয়তঃ সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার উভয়ের ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কল্যানকামী রাষ্ট্রের সঙ্গে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকার উভয়েরই সম্পর্ক আছে। মানবাধিকার ভোগের মধ্য দিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ সামাজিক ন্যায়বিচারই মানবাধিকার রক্ষার ও বিকাশের সুযোগ তৈরি করে দেয়।

চতুর্থতঃ বর্তমানে প্রচলিত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে মানবাধিকার আইনগতভাবে স্বীকৃত একটি বাস্তব ধারণা; অপরদিকে ন্যায়বিচারের ধারিণাটি হল একটি আদর্শগত ও বিমূর্ত ধারণা। তবে নৈতিকতার প্রেক্ষিতে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে প্রচলিত কয়েকটি তত্ত্বের তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত তত্ত্বগুলির যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করা না গেলে মানবাধিকার যথাযথভাবে বিকাশলাভ করতে পারে না। তবে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ রয়েছে যেখানে ব্যাক্তিগত স্বাধীনতা সম্বলিত রাজনৈতিক ও নাগরিক বিষয়ক মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রয়োজনটিকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে। অনুন্নত দেশের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের চিন্ড্রধারা নির্ভর করে আমাদের পর্যালোচনার ওপর আর সেই প্রক্রিয়ার নিশ্চয়তার জন্য আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং নাগরিক অধিকারের বিষয়টি অক্ষুণ্ণ রয়েছে কিনা সেটি সুনিশ্চিত করতে হবে। এই প্রসঙ্গেই অমর্ত্য সেন বলেন যে, আর্থিক অনটনের তীব্রতা রাজনৈতিক স্বাধীনতার আশু প্রয়োজনীয়তার সহায়ক।[৮] তাই অর্থনৈতিক অধিকার মানবাধিকার সংক্রান্ত

আলোচনার একটি বাস্তব সমস্যা। তবে সামাজিক ন্যায়বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যজনিত কারণে অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষা করা বা অর্জন করার সংগ্রামের সঙ্গে মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন কতটা সক্রিয় হবে তা নিয়ে মতোবিরোধ রয়েছে।

তবে যাইহোক না কেন মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হল গণতন্ত্র। তাত্ত্বিকভাবে গণতন্ত্র এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে সার্বভৌম শক্তি অধিষ্ঠিত সকল স্বাধীন নাগরিকের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রযুক্ত হয়। তাই মানবাধিকারের যথার্থ উপলব্ধির জন্য মানবিক মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা থাকা আবশ্যক। এই মানবিক মর্যাদা নির্দিষ্ট কোনো ধারণা নয়। এ হল এক গতিশীল ধারণা। সামাজিক ন্যায়বিচার স্বাধীনতা, সাম্য, গণতন্ত্র প্রভৃতি ধারণার মধ্যেই মানবিক মর্যাদার সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি ঘটে। মানবাধিকার যেহেতু মানুষের জীবনে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত সেহেতু দেশের শাসনব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধি হিসেবে জনগণ অংশগ্রহণ করতে না পারলে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলির স্বাভাবিক চর্চা বিঘ্নিত হয়। তাই মানবাধিকারকে সুফলপ্রসু করার ক্ষেত্রে সবার প্রথমে আমাদের অন্তরশুদ্ধি প্রয়োজন। কেননা অন্তরের শুদ্ধি না ঘটলে মানবাধিকার কেবল লাঞ্ছিত হবে না, মানুষের অস্তিত্বও একদিন বিপন্ন হয়ে যাবে। যার জন্য কেবল আমরাই দায়ী থাকব যা নৈতিক দিক থেকে কখনোই সমর্থন যোগ্য নয়।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী

১. চক্রবর্তী, সোমনাথ ঃ কথায় কর্মে এথিক্স, ২০০২, কোলকাতা ঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। পৃ. ১৯১।

২. ঘোষ, সঞ্জীব ঃ নীতিবিদ্যা, ২০০৮, কোলকাতা ঃ ব্যানার্জী পাবলিশার্স। পৃ. ১০৪।

৩. গুপ্ত, দীক্ষিত ঃ নীতিশাস্ত্র, ২০০৭, কোলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ।পৃ. ১৭৬।

৪. তদেব, পৃ. ১৭৭।

৫. তদেব, পৃ. ১৮০।

৬. *Barker, Robert, L : The Dictionary of Social work, 1995, Washington D.C. NASW Press.*

৭. *Mill, J.S. : Utilitarianism, 1863, London : Penguin Books.*

৮. সেন, অর্মত্য : উন্নয়ন ও সক্ষমতা, ২০০৫, কোলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স। পৃ. ১৪৯।

প্রবন্ধ

ভারতীয় শিক্ষার বিবর্তন

সনাতন সাহু, অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

প্রাচীনকালের শিক্ষা ছিল গুরুকুলকেন্দ্রিক। প্রাচীনকালে সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত ছিল না। প্রাচীন ভারতে বেদ পাঠ ছিল শিক্ষালাভের একটি প্রধান দিক। শিক্ষা যেমন সর্বজনীন ছিল না, তেমনি শিক্ষাব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপও বহুকাল পর্যন্ত লক্ষ করা যায়নি। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার্থীদের কঠোর নিয়মকানুন মেনে চলতে হতো। ছাত্রাবস্থায় ব্রহ্মচর্য পালন বাধ্যতামূলক ছিল। সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা বা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার মূল বা চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীর আত্মিক উন্নতি সাধন। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাধারা জাতি বা বর্ণভিত্তিক সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসকে লোকমানসে মান্যতা দিতে কার্যকর সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। ভারতীয় শিক্ষাধারা ছিল গুরুমুখী শুনে শেখা। কারণ বেদ কণ্ঠস্থ করতে হতো এবং মুখস্থ রাখতে হতো। ছাত্রদের জন্য কোনো গ্রন্থ ছিল না। তাই বই পড়ে বেদ মুখস্থ করা চলত না। জোর গলায় পাঠ করা এবং বেদবর্ণ কর্ণগোচর করা বেদ-অধ্যয়নের অঙ্গ এবং গুরুর কাছে শুনেই তা করতে হতো। ব্রাহ্মণ্য যুগে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা আবর্তিত হয়েছিল যজ্ঞানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। বর্ণাশ্রম প্রথা এবং চতুরাশ্রম ব্যবস্থা এই যজ্ঞানুষ্ঠানকে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্র দান করেছিল। একদিকে পরমজ্ঞান, সত্যোপলব্ধি এবং অন্যদিকে পার্থিব দায়িত্ব পালন। এই দুই লক্ষ্য পূরণের জন্য গুরুগৃহে-তপোবন আশ্রমে বিদ্যাকে দুভাবে পরিবেশন করা হতো-পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা।'পরাবিদ্যা' হল পরমজ্ঞান লাভের জন্য তিন বেদ ছয় বেদাঙ্গ অনুশীলন করা; আত্মসংযম এবং যোগসাধনা দ্বারা এই বিদ্যা অর্জন করতে হতো। আর 'অপরাবিদ্যা'র অর্থ হলো পার্থিব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনে যা কিছু প্রয়োজন তার অনুশীলন করা। বৈদিক শিক্ষা এই 'পরা' ও 'অপরা' বিদ্যার সমন্বয় ছিল। সুলতানি আমলে বাংলায় শিক্ষার তিনটি স্তর ছিল: প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চস্তর। প্রাথমিক শিক্ষা মসজিদ সংলগ্ন মক্তবে কিংবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, মন্দিরে, অভিভাবক বা শিক্ষকের গৃহে, পথিকের বিশ্রামগৃহে অথবা গাছের নিচে প্রদান করা হতো। মুসলিম সমাজের প্রতিটি শিশু চার বছর চার মাস চার দিন বয়সে উপনীত হলে তাকে সুন্দর পোশাকে সাজিয়ে পরিবারের সব সদস্য ও অন্য স্বজনদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদানের সূচনা করা হতো। মধ্যযুগেও তা ছিল মুখস্থ কিংবা আবৃত্তি করার ব্যাপার। শিশুরা সাত বছর বয়সের আগেই বারো অধ্যায়ের সিদ্ধ-বাস্তু পাঠ করত। বাংলায় সুলতানি শাসনামলে মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরের বিদ্যালয়গুলো 'মাদ্রাসা' নামে আখ্যায়িত ছিল। সে যুগের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র মক্তব থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত শিক্ষার সর্বস্তর ছিল অবৈতনিক। পাঠশালার পড়াশোনা শেষ করে যে কেউ ইচ্ছা করলে টোল বা মাদ্রাসায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে উপনিবেশিক দেশগুলির ভূমিকা ছিল যথেষ্টই। তারা নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী ভারতে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছিল। এদের মধ্যে ইংরেজদের ভূমিকা ছিল অনেক বেশি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদ আইন অনুযায়ী প্রতি কুড়ি বছর অন্তর নতুন করে

শিক্ষানীতি চালুর নিয়ম ছিল। ১৮১৩ সালে সনদ আইনের মাধ্যমে ভারতের জনগণের শিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত এক লক্ষ টাকা কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে এ সম্পর্কে লর্ড মেকলের প্রদত্ত মতামতই নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি নামে অভিহিত।

মেকলের মতে- এমন এক শ্রেণির লোক গড়তে হবে যারা আমাদের দোভাষীর কাজ করবে। তারা হবে এমন একশ্রেণির লোক যারা রক্তের বর্ণে ভারতীয় কিন্তু রুচি, নীতি ও বুদ্ধিতে ইংরেজ। নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ধ্বংস ডেকে এনেছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে শিক্ষা সংক্রান্ত যতগুলো নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছিল তার মধ্যে উডের ডেসপ্যাচ ১৮৫৪ সর্বাপেক্ষ গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ পরবর্তীকালে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে তথা শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় যত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে সব কিছুর মূলে উডের ডেসপ্যাচের কিছু না কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উডের শিক্ষানীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলে- এটি শিক্ষার নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি ত্যাগ করে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে দায়িত্ব স্বীকার

করে নেয়। এক কথায় বলা যায় যে, স্বাধীন ভারতে ঔপনিবেশিক পাকিস্তান আমলের পূর্বে বাংলায় এবং বাংলাদেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলে এসেছে তার ভিত্তি রচিত হয়েছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই শিক্ষা দলিলে। উডের ডেস প্যাচের লক্ষণীয় দিক হল-

১) ডেসপ্যাচে ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের দায়িত্ব স্বীকার

২) শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উন্নতি কল্পে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাদান কিভাবে চলবে এসম্বন্ধে সুপারিশ। বৃটিশ ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন হান্টার কমিশন (ভারতীয় শিক্ষা কমিশন)। ১৮৫৪ সালে ডেসপ্যাচের পর ১৮৮২ সাল পর্যন্ত শিক্ষার অগ্রগতি পরিমাপ এবং শিক্ষা নীতিমালা পর্যালোচনার জন্য হান্টার কমিশন গঠিত হয়। উডের ডেস প্যাচে (১৮৫৪) সাল ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য যেসব উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল তার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সরকারি দায়িত্ব গ্রহণ। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদান প্রদানের রীতি গ্রহণ এবং ধীরে, ধীরে শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দীর্ঘদিন পরও পরিকল্পনাসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় জনমনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। কমিশন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং অনুদান প্রথার উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে দেশীয় শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা ও নারী শিক্ষা প্রভৃতি বিস্তার কল্পে বিভিন্ন যুগোপযোগী পরিকল্পনাসহ অর্থ, অনুদান পাঠক্রম বিষয়ক সুপারিশ প্রদান। কমিশনই সর্ব প্রথম প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে বর্ণনা করেন এবং এর ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথ সুপ্রশস্ত করেন। তবে একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, প্রথম শিক্ষা কমিশন হিসেবে হান্টার কমিশন উপমহাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে লর্ড কার্জনের শাসনকাল নানাভাবে স্মরণীয়। ১৮৯৮ সালে ডিসেম্বর মাসে লর্ড কার্জন উপমহাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। গভর্নর জেনারেলদের মধ্যে তিনি একজন প্রত্যুপন্নমতি সম্পন্ন এবং শক্তিশালী শাসক ছিলেন। ভারতীয়দের নিকট তিনি বিভিন্ন ভাবে সমালোচনার পাত্র হিসেবে বিবেচিত। তবে এ উপমহাদেশে তার শিক্ষা সংস্কার নানাভাবে প্রশংসনীয়। লর্ড

কার্জন ১৯০১ সালে সিমলায় একটি শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে প্রতিটি প্রদেশের জনশিক্ষা পরিচালক, উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। কোনো ভারতীয় শিক্ষাবিদকে এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এই সম্মেলনে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় সমস্যা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। একপক্ষকাল ব্যাপি আলাপ আলোচনা শেষে ১৬০টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে লর্ড কার্জন তার শিক্ষা কর্মসূচি রচিত করেন। কার্জনের সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা সংস্কার ও ১৯০৪ সালে ভারত সরকারের শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রস্তাবসমূহ এই সম্মেলনে গৃহিত প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়। লর্ড কার্জন এদেশে শিক্ষা সংস্কারের যত চেষ্টাই করেছিলেন তাকে বিপুল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবে এদেশের শিক্ষা উন্নয়নে তার আন্তরিকতা ছিল সর্বজন স্বীকৃত। সুতরাং একথা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করা যায় যে, বর্তমান শতাব্দীর প্রচলিত শিক্ষা ধারার সূত্রপাত ঘটে তারই শাসনকালে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের সংস্কার ছিল সুদূর প্রসারী। প্রখ্যাত ইংরেজ শিক্ষাবিদ এবং লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে একটি কমিশন গঠন করে। ১৯১৯ সালে শেষ দিকে এ রিপোর্ট পেশ করা হয়। এ কমিশনকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনও বলা হয়। ভারতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় এটি অত্যন্ত মূল্যবান দলিল। মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার এবং পরিকল্পনার জন্য এ কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্যাডলার কমিশন ইন্টারমেডিয়েট পাসকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা বলে বিবেচিত করেন। এ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে পূর্ববঙ্গের মানুষের জন্য উচ্চ শিক্ষার বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়। এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে এত মূল্যায়ন আর কোনো রিপোর্ট ইতিপূর্বে রচিত হয়নি। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার এমন কোনো প্রয়োজনীয় দিক নেই যা এ কমিশন আলোচনা করেননি।

ভারতে বৃটিশ শাসনামলে যতগুলো শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছিল তার মধ্যে সার্জেন্ট পরিকল্পনা গুণগত দিক থেকে অত্যন্ত উঁচু মানের ছিল। কিন্তু শিক্ষাকে যদি আমরা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করি তাহলে অর্থের অভাবে শিক্ষার অগ্রগতি রোধ করা সমীচীন নয়। বৃটিশ শাসনে ভারতের শিক্ষা যে সঠিক পথে পরিচালিত হয়নি। একথাটি সার্জেন্ট কমিটি বলতে পেরেছেন। শুধু ত্রুটি দেখিয়ে কমিটি তার বক্তব্য শেষ করেনি। পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহায্যে তা মূল্যায়ন করার ও সুপারিশ ছিল। উডের ডেসপ্যাচের পর এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যবহুল শিক্ষা পরিকল্পনা আর রচিত হয়নি। ইংরেজ আমলে রচিত একটি শিক্ষা পরিকল্পনা রচনায় তিনি যে সাহসিকতা ও সংকীর্ণমুক্ত উদার সৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে ছিলেন সে যুগে তা দুর্লভ। তার খসড়া পরিকল্পনাকেই আদল বদল করে পরবর্তী জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা সমূহ প্রণীত হয়েছে। সার্জেন্ট পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা প্রভৃতির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পরবর্তীতে এদেশের শিক্ষা পরিকল্পনার অনেক উপাদান সার্জেন্ট পরিকল্পনা থেকে নেয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে ভারত স্বাধীনতা লাভের পর থেকে শিক্ষা কমিশনগুলি সার্বজনীন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলে। ভারতের ৬ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত সকল শিশুকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য নানান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। এই কর্মসূচি গুলির মধ্যে সর্বশিক্ষা অভিযান খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। বর্তমানে শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল- শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটানো এই জন্য আধুনিক শিক্ষাকে

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা বলা হয়। প্রাচীনকালের সেই গুরুকুল কেন্দ্রিক শিক্ষার থেকে বেরিয়ে নানান কালক্রম পেরিয়ে বর্তমানে শিক্ষার প্রধান উপাদান তথা শিক্ষার্থী বা শিশু তার বিকাশ সাধনে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। এই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। যেখানে শিশুর চাহিদা আগ্রহ ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এইভাবে নানান বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে শিক্ষা তার প্রকৃত দিশা খুঁজে পেয়েছে। এখন পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে বেরিয়ে ব্যবহারিক, মূল্যবোধকেন্দ্রিক নৈতিকতার বিকাশমূলক শিক্ষার ওপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। ২০২০ এর জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষার লক্ষ্য শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধি নয়, শিক্ষার্থীদের চরিত্রগঠন ও সার্বিক বিকাশের দিকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল বহুবিভাগীয় এবং অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার উপর এর ফোকাস। এই নীতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধান এবং জীবন দক্ষতা বিকাশের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়। জাতীয় শিক্ষানীতি -র লক্ষ্য এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করা যা সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তাকে উৎসাহিত করা, মুখস্থ করার পরিবর্তে। নীতিমালায় ছাত্রদের আরও কর্মসংস্থান ও দক্ষ করে তোলার জন্য ছোটবেলা থেকেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এছাড়াও শিক্ষার্থীদের জন্য আরও অ্যাক্সেসযোগ্য এবং ব্যক্তিগতকৃত শেখার অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য শিক্ষায় প্রযুক্তির সুবিধা নিতে চায়। নীতিটি ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং ডিজিটাল সরঞ্জামগুলির ব্যবহার কল্পনা করে।

এটি COVID-19 মহামারীর সময় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, যেখানে অনলাইন শিক্ষা ভারতের লক্ষ লক্ষ ছাত্রদের জন্য আদর্শ হয়ে উঠেছে। আরেকটি বড় পরিবর্তন যা জাতীয় শিক্ষা নীতি 2020 (NEP) নিয়ে এসেছে তা হল স্কুল শিক্ষার জন্য একটি নতুন কাঠামো প্রবর্তন। 5+3+3+4 গঠন, যা আগের ১০+২ কাঠামোকে প্রতিস্থাপন করে, স্কুল বছরগুলিকে শেখার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করে। প্রথম পাঁচ বছর (বয়স ৩-৮) ভিত্তি পর্যায়ে উৎসর্গীকৃত, যেখানে ফোকাস খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা, আবিষ্কার এবং কার্যকলাপ-ভিত্তিক শিক্ষার উপর। পরবর্তী তিন বছর (বয়স ৮-১১) হল প্রস্তুতিমূলক পর্যায়, যেখানে ফোকাস পরীক্ষামূলক শিক্ষা এবং অনুসন্ধানমূলক শিক্ষার উপর। পরবর্তী তিন বছর (বয়স ১১-১৪) হল মধ্যম পর্যায়, যেখানে ফোকাস বহু-বিভাগীয় শিক্ষা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং সমস্যা সমাধানের প্রচারের উপর। চূড়ান্ত চার বছর (বয়স ১৪-১৮) হল মাধ্যমিক পর্যায়, যেখানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয় থেকে বেছে নিতে পারে এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নিযুক্ত হতে পারে। অন্যান্য সংস্কার, যেমন ৫ শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষায় নির্দেশনা এবং নতুন নীতিতে সামাজিক ও আর্থিকভাবে প্রতিবন্ধী গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ বিধান, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিশেষজ্ঞদের দ্বারাও সমাদৃত হয়েছে। এর জন্য পাঠক্রমের বহর কমিয়ে শিক্ষার্থীদের মৌলিক চিন্তায় উৎসাহ, বিমূর্ত চিন্তা, আলোচনামূলক, বিশ্লেষণ মূলক বিষয় গুলোকে যুক্ত করার কথা বলা হয়। যার ফলে শিক্ষার্থীদের মৌলিক সত্তার বিকাশ যেমন হবে তেমনি কর্মকেন্দ্রীক দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত কৌশল ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

প্রবন্ধ

মুর্শিদাবাদের কারুশিল্প

ড. সুমিত কুমার মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

শিল্পকলা বিদ্যার দুটি শাখা বিদ্যমান- ১) চারু কলা ২) কারু শিল্পকলা। চারু শিল্পকলা বলতে আমরা সাধারণত বুঝি রং তুলির সাহায্যে চিত্র অংকন ও সূচি শিল্পকে। অন্য দিকে কারু শিল্প বলতে বোঝায় সাধারণত মৃৎশিল্প, বস্ত্রশিল্প (তাঁতশিল্প), কাঁসা পিতল শিল্প এছাড়া শোলা শিল্প, শঙ্খ শিল্প এবং গজদন্ত শিল্প ইত্যাদি শিল্পকে বোঝায়। মুর্শিদাবাদ জেলার খ্যাতি স্থাপত্য ও চিত্রকলার পাশাপাশি কারু শিল্প ও তার নিজস্ব ঘরানা তৈরি করে রেখেছে। যা মুর্শিদাবাদ ঘরানা নামে পরিচিত হয়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে। মুর্শিদাবাদের এই মননশীল কারু শিল্পের সঙ্গে শাসক শ্রেণীর মনোভাব ও রুচির একটা সুসম্পর্ক রয়েছে। মুর্শিদাবাদের এই কারু শিল্পগুলি বিকশিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের বাংলার নবাবী ও সংশ্লিষ্ট জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায়।[১] এই কারণে এই সকল শিল্পের ভৌগোলিক অবস্থান মুর্শিদাবাদ শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। আবার শাসক শ্রেণীর চরিত্র বদলের সঙ্গে সঙ্গে অথবা জেলার রাজনৈতিক-প্রশাসনিক গুরুত্বের সূত্রে এই সকল শিল্পগুলির অস্তিত্ব ও সম্ভাবনার দিকগুলিও পরিবর্তিত হয়েছে।

রেশম শিল্প ঃ- মুর্শিদাবাদের কারু শিল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রেশম শিল্প। রাঢ় বঙ্গে রেশম শিল্পের বিকাশ প্রাচীনকাল থেকেই লাভ করে আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'পত্রোর্না' ও 'দুকুল' শব্দ দুটি উল্লেখ রয়েছে। মনে করা হয় 'পত্রোর্না' হলো রেশম বস্ত্র এবং 'দুকুল' হল সূতি বস্ত্র। এই দুই প্রকার বস্তু উৎপাদনের স্থান হিসাবে সুবর্ণাকুডা-র উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে রয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, এই সুবর্ণকুডা'ই হল পরবর্তীকালে কর্ণসুবর্ণ। মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ-ই ছিল শশাঙ্কের রাজধানী। মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্পের কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন তেমন ভাবে পাওয়া না গেলেও বলা যায় যে, বাংলায় মুর্শিদাবাদ জেলার রেশম শিল্পের উৎপাদন শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শুরুতেই। ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হলে নবাব পরিবারের চাহিদা মতো বেশ কিছু অ-রেশম শিল্পীকে মুর্শিদাবাদে আনা হয়েছিল।[২] সেই সূত্র ধরে মুর্শিদাবাদে ধারাবাহিকভাবে রেশমের উৎপাদন ও রেশম বস্ত্র তৈরি শুরু হয়। তাভার নিয়ের কাশিমবাজার থেকে ইউরোপে ও পূর্ব এশিয়ার বাজারে রেশমের বস্ত্র রপ্তানির কথা উল্লেখ করেছেন। জগৎ শেঠ পরিবার ব্যবসার জন্য যে টাকা দিত তার মধ্যে মুর্শিদাবাদের বস্ত্রের উল্লেখ আছে। ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধের পরে মুর্শিদাবাদের দরবার থেকে যে সকল মূল্যবান উপহার সামগ্রী পেয়েছিলেন তার মধ্যে রেশম বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোম্পানীর আমলে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের যে অবক্ষয় শুরু হয়েছিল তার প্রভাব এই মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্পের উপর পড়েছিল তা বলা যায়। রেশম শিল্পের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদে আরো একটি নিজস্ব বস্ত্র উৎপাদন রীতি ছিল বালুচরী বস্ত্র। এটি মূলত মহিলাদের শাড়ি হিসেবে প্রসিদ্ধ। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের অন্তর্গত বালুচর গ্রাম থেকে এর উৎপত্তি। শিল্পী দুবরাজ চামার বালুচরী বস্ত্রের জন্য ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে এবং ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে দুটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছিলেন।[৩]

শঙ্খ শিল্প ঃ- মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্পের যেমন দরবারি পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। শঙ্খ শিল্পের ক্ষেত্রে তেমনটি

হয়নি। তার কারণ এই শিল্পের নান্দনিক সৌন্দর্যের লৌকিক প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। মূলত হিন্দু পুজোর উপকরণ হিসাবে মঙ্গল শঙ্খের ব্যবহার আছে। এর পাশাপাশি হিন্দুরীতি অনুসারে বিবাহিত মহিলারা মাঙ্গলিক প্রতীক হিসাবে শাঁখার চুড়ি পরে থাকে। ফলে এই শিল্পের জনমানসে যে চাহিদা ছিল তাকে ব্যবহার করেই শিল্পের প্রসার ঘটেছিল তা বলা যায়। এই শিল্পের আবহমান চাহিদা ছিল। এই চাহিদা থেকে এই শঙ্খ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঘটেছিল তা বলা যায়। প্রায় ৪০০ বছর আগে থেকেই মুর্শিদাবাদে এই শিল্পের অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার শঙ্খ শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল জিতপুর গ্রাম।[৪] এই গ্রামে প্রায় ৯৫ শতাংশ মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। দেশভাগের আগে থেকে সমগ্র বাংলাদেশেই মুর্শিদাবাদের এই শাঁখা রপ্তানি করা হত। তবে দেশভাগের পর পূর্ব ভারতে এর বিপুল চাহিদা আছে বলে এই শিল্পের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

কাঁসা-পিতল শিল্প ঃ- মুর্শিদাবাদ জেলার কারু শিল্পের মধ্যে অন্যতম একটি শিল্প ছিল কাঁসা-পিতল শিল্প। মুর্শিদাবাদ জেলার অর্থনীতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী কাঁসা-পিতল শিল্প। একসময় পূর্ব বঙ্গের ঢাকা ও নবাবগঞ্জের কাঁসা-পিতল শিল্পের সুখ্যাতি ছিল। ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হলে বেশ কিছু কাঁসা-পিতল শিল্পী ঢাকা থেকে এই শহরে চলে এসেছিল। মুর্শিদাবাদের বহরমপুর সংলগ্ন কাদাই, খাগড়া, জিয়াগঞ্জের বড়নগর এলাকায় তারা বসতি স্থাপন ও শিল্প কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল।[৫] বহরমপুরের কাদাই ও খাগড়া ছিল সুপ্রসিদ্ধ ও প্রাচীন কাঁসা-পিতল শিল্প কেন্দ্র। এই খাগড়া অঞ্চল কাঁসারিপট্টি ও কাঁসারি বাজার নামে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। হান্টারের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁসা-পিতল শিল্প কলকাতা, পাটনা, লখনউতে ও বর্হিদেশে রপ্তানি হত। ১৯৩০ ও ১৯৪০ এর দশকের জনগণনা অনুসারে এই এলাকায় প্রায় ১৫০ থেকে ১৮০টি কাঁসা-পিতল কারখানা ছিল।[৬]

শোলা শিল্প ঃ- মুর্শিদাবাদ জেলার আরো একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্প হল শোলা শিল্প। জলজ উদ্ভিদ শোলাকে ব্যবহার করে হিন্দু দেবদেবীর সাজ, চাঁদমালা, বিবাহের সাজ-সরঞ্জাম নানা প্রকার নকশা তৈরি করা হয়। ধর্মীয় কাজে এই সকল প্রথাগত ব্যবহার পাশাপাশি শিল্পীর নান্দনিক স্বত্ত্বা প্রকাশের মাধ্যম হিসাবেও এই শোলা শিল্পের ব্যবহার মুর্শিদাবাদ ঘরানাতে দেখা যায়। মুর্শিদাবাদ জেলার শোলা শিল্প সারা ভারতবর্ষ ও বর্হিভারতে ও বিদেশে স্থান পেয়েছিল। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার নসীপুর রাজবাড়ির শোলার দ্বারা তৈরি প্রতিকৃতি লন্ডনের প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল।[৭] এই শোলা শিল্প ছিল স্থানীয় অঞ্চল ভিত্তিক ও পারিবারিক একটি শিল্প। মুর্শিদাবাদের শোলা শিল্পীদের (প্রফুল্ল মালাকার, যজ্ঞেশ্বর মালাকার, হিরন্ময় কর্মকার, নির্মল কর্মকার, সুভাষচন্দ্র সরকার) দ্বারা নির্মিত শোলার প্রতিকৃতির তাজমহল, ফুলের ঝাড়, দুর্গামূর্তি, বাজরা নৌকা, বিভিন্ন মনীষীদেরও মূর্তি সর্বত্র চাহিদা ছিল। কারু শিল্পের চাহিদা বর্তমানে কমে গেলেও শোলা শিল্পের চাহিদা ও প্রসারতা বর্তমানে রয়ে গেছে। বর্তমানে চীন, জাপান ও জার্মানিতে মুর্শিদাবাদের শোলার প্রতিকৃতি রপ্তানি করা হয়।[৮]

গজদন্ত শিল্প ঃ- বাংলার কারু শিল্পের ইতিহাসে মুর্শিদাবাদের গজদন্ত শিল্প অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি শিল্প। এই শিল্পের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতি রয়েছে। বাংলার জঙ্গলমহল এবং পূর্ব ভারত থেকে পুরুষ দাঁতাল হাতির দাঁত সংগ্রহ করে তাকে নানা রকম নকশার মাধ্যমে রূপদান করা হয়। নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করার সঙ্গে সঙ্গে নবাব ও তাঁর পারিষদদের মনোরঞ্জনের জন্য ঢাকা থেকে বেশ কিছু গজদন্ত মুর্শিদাবাদে আনা হয়। মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজার, সৈদাবাদ, জিয়াগঞ্জ এর এনাতুলিবাগ অঞ্চলে তাদের বসতি স্থাপিত হয়েছিল। গজদন্ত শিল্পের অসংখ্য নিদর্শন হাজারদুয়ারির প্রাসাদে ছড়িয়ে রয়েছে। মুর্শিদাবাদে নির্মিত গজদন্ত

চেয়ার ও রেকাবি গর্ভনর ওয়ারেন হেস্টিংসকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে এগুলি লন্ডনের সংগ্রহশালাতে আছে। মুর্শিদাবাদ-এর গজদন্ত শিল্পের আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছিল।[৯]

দারু শিল্প ঃ- ভারতীয় দারু শিল্প বা তক্ষন শিল্প মুর্শিদাবাদের প্রাচীনকাল থেকেই প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পাটলিপুত্রের কাঠের প্রাসাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। পাল ও সেন যুগের ধীমান ও বিতপাল দারু শিল্পী হিসাবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলপ্রাচীন কাল থেকেই। নবাবী আমল থেকেই এই শিল্প রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আছে। এই সময়কালে মুর্শিদাবাদে বড়ো বড়ো ময়ূরপঙ্খী, বাজরা, হাতির পিঠের তানজাম, সিংহাসন, পালঙ্ক, দরজা-জানালার কারুকার্য ও নানান প্রকার মূর্তি তৈরি করা হয়ে থাকে সুপ্রাচীন কাল থেকেই। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের হিন্দু জমিদার পরিবারগুলির জন্য কাঠের রথ, দেবদেবীর মূর্তি, ঘোড়া, পরি দ্বাররক্ষী ইত্যাদি তৈরি করা হতো।

মুর্শিদাবাদের বহু দক্ষ ও নিপুণ দারু শিল্পীগণ বিভিন্ন রকম শিল্প নিদর্শন যেমন চন্দন কাঠের পালঙ্ক, কাঠের পাদুকা ও কাঠের ফটো ফ্রেম শিল্পীরা তৈরি করে থাকেন। এই দারু শিল্পীগণ মর্যাদাও পেয়েছিলেন, এর সঙ্গে সঙ্গে এই দারু শিল্পী রাজকীয় অনুগ্রহে বিকাশ লাভ করেছিল। মুর্শিদাবাদের কারু শিল্পীগণ (মণীন্দ্র মিস্ত্রি, সীতারাম মিস্ত্রি) কাঠের ময়ূরপঙ্খী, বাজরা, নৌকা ও বিভিন্ন রকম পালকি নির্মান করত, যা সকলকে মুগ্ধ করত। শুধুমাত্র নবাব পরিবারে নয়, অনেক ধনী ও সভ্রান্ত পরিবারেও এই শিল্পের দ্রব্য সামগ্রীর যথেষ্ট চাহিদা ছিল। জগৎ শেঠের কাঠগোলা বাগানবাড়িতে বিদেশ থেকে আমদানি করা কাঠ থেকে সুসজ্জিত শিল্প সামগ্রী তৈরির জন্য বিশেষ কারখানা ছিল।[১০] দীর্ঘদিন ধরে কাঠকে সংরক্ষণ করে তারপরে শিল্পী নিপুন দক্ষতায় তাকে শিল্পের মাধ্যমে জীবন্ত প্রতিমূর্তি তৈরি করা হতো। মুর্শিদাবাদের কান্দির জমিদার পরিবারে কাঠের দেববিগ্রহ স্থাপন করা হয়েছিল, যেগুলির মান ও সৌন্দর্য ছিল অপূর্ব।

তথ্যসূত্র

১.সৌমেন্দ্র কুমার গুপ্ত, চেনা মুর্শিদাবাদ : অচেনা ইতিবৃত্ত।

২.মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার, ২০০৩।

৩.সুদীপ্ত সাধুখাঁ ও গোপাল মন্ডল, দক্ষিণবঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাসে নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ।

৪.মুর্শিদাবাদ জেলা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, ২০০৩।

৫.আশুতোষ দত্ত, কংসবণিক পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

৬.আশুতোষ দত্ত, কংসবণিক পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ ।

৭.সুদীপ্ত সাধুখাঁ ও গোপাল মন্ডল, দক্ষিণবঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাসে নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ।

৮.সাক্ষাৎকার, স্বপন পাল (কাঁসা শিল্পী) বহরমপুর (খাগড়া) ২০. ০৩. ২০১৫।

৯.মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার,২০০৩

১০.প্রাগুক্ত।

প্রবন্ধ

সামাজিক পরিসরে নারীর ভূমিকা ও অংশগ্রহণ

আব্বাসউদ্দিন মন্ডল
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

সামাজিক ভূমিকা কোনোভাবেই বৃহত্তর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এটি সবার জানা যে, পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে অসমতা রয়েছে। নারীর সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে প্রায়ই, বিশেষত অর্থব্যয়, সন্তানদের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বামীর মতামত জরুরি, যেসব ক্ষেত্রে পুরুষের বেলায় জবাবদিহিতা কম। সম্পত্তিতে নারীর মালিকানা ও অধিকারের বিষয়েও তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা যায় নি এ যাবৎ, যা এখনো তীব্রভাবে পুরুষ মতাদর্শ ও নিয়ন্ত্রণে বাঁধা। অবশ্য নারীদের শিক্ষার বিষয়ে অভিভাবকদের আগ্রহ অনেক বেড়েছে, যদিও উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণে এখনো নানা প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। বিশেষভাবে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, নারীর প্রতি নানা ধরনের সহিংসতা, নারীবান্ধব যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি এখনো বড়ো বাধা হয়ে আছে। এসবের ফলে সার্বিকভাবে এখনো মেয়েরা পিছিয়ে রয়েছে অনেক জায়গাতেই।

পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ভূমিকা ঃ নারীদের বৈবাহিক মর্যাদা যাই হোক, অনেক বিষয়েই সিদ্ধান্ত নিতে গেলে তাদের পুরুষদের মতামত বা অনুমতি নিতে হয়। বিয়ের আগে এই ভূমিকায় সচরাচর থাকে বাবা, যে জায়গাটা বিয়ের পর স্বামী নিয়ে নেয়। অনেক ক্ষেত্রেই বিয়েতে তাদের মতামত নেওয়া হয় না বা নেওয়া হলেও সেটাকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। আজকাল মেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে যদি তাদের পছন্দের কোনো ছেলে থাকে, তারা বাবা-মাকে বুঝিয়ে সম্মতি আদায়ের চেষ্টা করে থাকে।

নারীদের শিক্ষা, চলাচল ও সেবা ঃ সাধারণভাবে মেয়েদের শিক্ষার হার বাড়ছে এবং অভিভাবকদের মধ্যেও কন্যাসন্তানদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও যথাযথ মনোযোগ বাড়ছে। তার পরেও অনেকের মধ্যে নারীশিক্ষার গুরুত্ব অবমূল্যায়নের একটা প্রবণতা দেখা যায়, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার বেলায়। অনেক সময় একটা বয়সের পর মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ এবং নারীর প্রতি সহিংসতার ব্যাপকতা অনেক বাবা-মাকে, বিশেষ করে তারা যদি নিম্নবিত্ত ও সামাজিকভাবে প্রান্তিক হয়, মেয়েদের শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করে। এ ধরনের পরিস্থিতির কারণেই হয়ত-বা পুরুষদের তুলনায় নারীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে পড়ার হার অনেক বেশি। শহর ও গ্রামাঞ্চল, উভয় পরিসরেই কেনাকাটাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে নারীদের ঘরের বাইরে যাওয়ার এবং ঘোরাফেরা করার মাত্রা বেড়েছে।

বাড়ির বাইরে সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ঃ বাড়ির বাইরে নারীদের সামাজিক অংশগ্রহণের সুযোগ ও গন্ডি এখনো তুলনামূলকভাবে সীমিত। নারীরা আত্মীয়স্বজনদের কাছে বেড়াতে যেতে পারে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আচার

অনুষ্ঠান বা আলোচনাসভায় অংশ নিতে পারে; তবে এসব ক্ষেত্রে সচরাচর সাথে পরিবারের পুরুষ সঙ্গী থাকে বা পাড়ার অন্যদের সাথে যাওয়া হয়। এনজিওদের কার্যক্রমে যেসব নারী যুক্ত রয়েছে, তাদের জন্য সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশ, র‍্যালি ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ বিরল নয়। এ ছাড়া, সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবাদে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও বিদ্যালয়ের মতো পরিসরে বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অন্তর্ভুক্তি দেখা যায়। তাদের অনেকে আজকাল এমনকি সালিশেও ভূমিকা রাখে ।

সম্পত্তির মালিকানা ঃ সাধারণত দেখা যায় , নারীদের মধ্যে সম্পত্তির মালিকানার হার খুব কম। নারীদের অনেকে উত্তরাধিকারসূত্রে যেমন বেশি সম্পদ পায় না, তেমনি নিজেদের অর্থ দিয়ে সম্পত্তি কেনার মতো যথেষ্ট আয়ও তারা করে না। আর বিবাহিত নারীরা যারা কিছুটা আয় করে, তাদেরও নিজেদের আয়ের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই। বরং এক্ষেত্রে স্বামীদের ভূমিকা থাকে যথেষ্ট। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে স্বামীর নামেই সম্পত্তি কেনা হয়। স্বামী সম্পদশালী হলে স্ত্রীর নামে কিছু সম্পত্তি কিনতে বা তাকে কিছু সম্পত্তি দান করে দিতে পারে, যাতে ভবিষ্যতে সন্তানদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে না হয়। তবে আজকাল জমি কেনার সময় যদি নারীরা অর্থের জোগান দেয়, তবে কিছু ক্ষেত্রে তাদের আংশিক মালিকানা দেওয়া হয়। অবশ্য নারীরা উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি পেলেও সেটার ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ কমই থাকে। যদি তারা সেই সম্পত্তি বেচে নগদ টাকা নিয়ে আসে, সে অর্থ অনেক ক্ষেত্রে স্বামীদের হাতে চলে যায়। তারা তা নিজের মতো করে খরচ করে ফেলতে পারে। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে কোনো হিসেবও রাখা হয় না। একইভাবে যেসব নারী নিজে আয় করে, তাদের সঞ্চয়ের ওপরও স্বামীরা ভাগ বসাতে চায় অনেক সময়। এ ছাড়া, এটাও দেখা গেছে, নারীরা যদি বেশ ভালো অংকের অর্থ জমাতেও পারে, কীভাবে তা খরচ করবে সে ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে একা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তবে এসব ব্যাপারে নারীদের সচেতনতা একটু হলেও বেড়েছে এবং এই পরিবর্তন চলছে।

যৌন হয়রানি ও নারীর প্রতি সহিংসতা ঃ জনপরিসরে নারীর প্রতি যৌন হয়রানি (যেমন ইভটিজিং) ও সহিংসতা কম-বেশি সর্বত্রই বিরাজ করছে। বয়স, শ্রেণি, পেশা, এলাকা ইত্যাদি নির্বিশেষে এ ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে নারীদের প্রায় সবাইকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়রানি বা সহিংসতার শিকার ব্যক্তি বা 'ভিকটিম' সামাজিক রীতিনীতির কারণে এবং লোকলজ্জার ভয়ে নীরব থাকে। তবে, বেশ কিছু জায়গায় হয়রানি ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধও গড়ে তোলা হচ্ছে। সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে যৌন হয়রানি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর কাজ চলছে। তাই কিছু জায়গায় রাস্তাঘাটে নারীদের উত্ত্যক্ত করার ঘটনা এখন কম হয় ।

পারিবারিক সহিংসতার মিশ্র চিত্র ঃ পারিবারিক পরিসরে ঝগড়া বিবাদ ও সহিংসতার পেছনে সচরাচর যেসব কারণের কথা জানা যায়, সেগুলোর মধ্যে যৌতুকের মতো বড়ো সামাজিক সমস্যা যেমন আছে, তেমনি রান্নাবান্না, ধোয়ামোছা বা বাচ্চাদের দেখাশোনা করার কাজে পারস্পরিক অসন্তোষের মতো 'তুচ্ছ' কারণও আছে। সরকারি- বেসরকারি নানা উদ্যোগের কারণে সহিংসতা কিছুটা হলেও কমেছে বিভিন্ন পর্যায়ে, যার মধ্যে পরিবারের পরিসরও রয়েছে।

সুপারিশ ঃ সামাজিক পরিসরে নারীর ভূমিকা ও অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে কতগুলি দিককে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। নিম্নে তার মধ্যে কয়েকটি তুলে ধরা হল -

১. বিনা পারিশ্রমিকে নারীদের করা ঘরের সব কাজকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া ।

২. শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার জন্য এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনে নারীদের নিরাপদে চলাচলের সুবিধার্থে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৩. এনজিওর বিভিন্ন কর্মকান্ডে শুধু নারীদের প্রতি বেশি নজর না দিয়ে কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদেরও আরো অধিক হারে সম্পৃক্ত করা, যাতে তাদের মধ্যে লিঙ্গীয় বিষয়াদিতে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় ।

পরিবার ও সমাজের পরিসরে নারীর ভূমিকা ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও আমরা একটা মিশ্র চিত্র দেখতে পাই। পরিবারে বা বৃহত্তর সামাজিক পরিমন্ডরলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের ভূমিকা এখনো পুরুষদের তুলনায় অনেক সীমিত। পরিবারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বেলায় নারীদের অনেক ক্ষেত্রেই স্বামীর মতামত নিতে হয়, কিন্তু এর উলটোটা সব ক্ষেত্রে দেখা যায় না। সম্পত্তির মালিকানা ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও নারীদের এখনো পুরুষদের প্রতি পক্ষপাতমূলক বিভিন্ন আইন, প্রথা বা চর্চার সাথে মানিয়ে চলতে হয়। যদিও সংবিধান এবং সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নারী এবং পুরুষকে সমান মর্যাদা ও সমান সুযোগসুবিধা প্রদান করেছে। সরকার সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করেছে। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও এনজিও সংস্থাগুলোর মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। পরিশেষে একথা বলা যায় যে, নারীদের নিজেদের সচেতন হতে হবে সবার প্রথম এবং নিজেদের অধিকার নিজেদের আদায় করে নিতে হবে। জাতি,ধর্ম,বর্ণ,স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষ সকল শ্রেণীর সকল মানুষকে সহানুভূতিশীল হতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা অনেক সময় এই বিষয়টি লক্ষ্য করি যে, পুরুষদের দ্বারা কোনো নারী নির্যাতিত হলে সমস্ত নারী সেই নির্যাতিত নারীর পাশে দাঁড়ায় না; জাতি, ধর্ম, বর্ণ বিভেদ এর কারনে। নারী-পুরুষসহ সকল মানব সমাজকে এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

প্রবন্ধ

উত্তরের হাওয়ায় ফেলে আসা স্মৃতিরা

গার্গী ব্যানার্জী
অধ্যাপিকা, *দর্শন বিভাগ*

শীত এসে গেছে গুটি গুটি পায়ে। আলমারি থেকে বেরিয়েছে সোয়েটার, টুপি, চাদর, শাল। বাক্স থেকে বেরিয়েছে লেপ, কম্বল সাথে নেপথলিন এর গন্ধমাখা স্মৃতি।

সেই ছোট্টবেলার ঠাকুমার আদরে বোনা সোয়েটার গায়ে হয় না, তবুও নেড়েচেড়ে রাখা থাকে। শীত বড় আলসে ঋতু, শীত বড় যত্নে থাকতে পছন্দ করে। সমস্ত উৎসব পার করে দীর্ঘ অবসাদ আবার আনন্দও থাকে। শীত কাছাকাছি আসার উষ্ণতা ভাগ করে নেওয়ার ঋতু। কনকনে ঠান্ডা উত্তর এর হাওয়াতে বেগুন পোড়ার গন্ধ ভেসে আসে। জোবুথবু হয়ে বসে রোদ আর স্মৃতির আঁচ পোওয়ানো। আলসেমি এর মেনু সব শীতের সবজি দিয়ে খিচুড়ি, বেগুন ভাজা বা পোড়া সাথে টমেটোর চাটনি, ডিমভাজা কখনও বা ছোট মাছ ভাজা। তারপর রোদ্দুরে পা মেলে বসে হাবিজাবি ভাবনা।

সেই ফেলে আসা দিন, হাঁড়কাঁপানো শীতের ভোরে সাইকেলে করে কুয়াশা ভেঙে টিউশন পড়তে যাওয়া। নাকের ডগা, আর হাতের আঙ্গুল গুলো শিরশির করতো ঠান্ডা তে। স্কুলে তখন উৎসবের আমেজ, ২৬শে জানুয়ারি,২৩শে জানুয়ারি স্কুলের স্পোর্টস-এর প্র্যাকটিস জোর কদমে। স্কুলের পাশের মাঠে রোদঝরা দুপুরে প্যারেড এর মহড়া চলত। টিফিনের বাড়তি পাওনা টোপাকুল এর সাথে নুনলঙ্কা গুঁড়ো, কখনও পেয়ারা মাখা। সোয়েটার কোমরে বেঁধে স্টাইলমারাটা তখন একটা বিরাট ব্যাপার। ফাইনাল পরীক্ষার চিন্তা ঘুরতো মাথায়। মাধ্যমিক আর উচ্চমাধ্যমিক এর সময় এই রকম শীতে টেস্ট পরীক্ষা শেষে রোদে পিঠ পেতে বসে টেস্টপেপার এর প্রশ্ন অভ্যাস করা হতো। খাতা ভরে থাকতো বাংলা, ভূগোলের ম্যাপ, ইতিহাস, অংক। ২৫ডিসেম্বর তখনও মধ্যবিত্ত বাঙালির উৎসব-এর আওতায় আসে নি। ২৫ ডিসেম্বর তখন একটা ফ্রুটকেক নয়তো খুব জোর একটা পিকনিক এর দিন। সন্ধ্যার টিউশন থেকে ফেরার পথে দেখতাম পাড়ার মোড়ের সদ্য খোলা কেক এর দোকানে টুপটাপ টুনি আলোতে সাজানো। কলেজের উল্টা দিকের চার্চ সাজছে রঙিন আলোর মালা আর কাগজের শিকল এর সাজে। মকর সংক্রান্তির আগের কয়েকটা দিন চারপাশের গলি গুলো ভারী হয়ে থাকতো গুড়ের পাকের নারকেল আর তিল নাড়ুর গন্ধে।

সন্ধ্যার টিউশন এ আর সাইকেল না, কারণ ফেরার পরে স্কুলের তাড়া নেই, সাথে ঠান্ডা জাঁকিয়ে পড়েছে। বিনুনি ঝুলিয়ে ব্যাগ দুলিয়ে তিনবান্ধবীর একটা দল। টিউশন পাড়ার মোড়ে মোমো এর সদ্য দোকানে ফেরার পথে টুঁ সাথে সুপ ফ্রি হুশহাশ করে খাওয়া, বাবা কি ঝাল!!! তারপর মুড়িসুড়ি দিয়ে একে অপরের সোয়েটারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাহাহিহি করতে করতে বাড়ি।

১লা জানুয়ারি গ্রীটিংস কার্ড ঝুলতো খাতা কাগজের দোকানে। টেডি, ফুল, পাহাড়ি দৃশ্য, কার্টুন এর ছবি দেওয়া –পছন্দ মতো কেনা হতো, বেস্টফ্রেন্ড এর জন্য সবার থেকে আলাদা। আর বাঙালির শীত যেটা ছাড়া ইনকমপ্লিট তা হোলো "বোরোলিন" আর ছাদ ভর্তি গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ এর ছড়াছড়ি। শীত মানে খেজুরগুড়, পিকনিক, সন্ধ্যার আগুন পোয়ানো। শীত হোলো বাকি সারাবছরের ব্যস্ততা থেকে একটু সরে এসে জীবনের রস আস্বাদন।

প্রবন্ধ

দেবতাতত্ত্বের পর্যালোচনা

ড. চন্দন পই (অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ)

ভারতীয় সংস্কৃতির মূলে অবস্থান করছে বেদ। সেই বৈদিক সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত সর্বত্রই দেবতার উপাসনা পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই দেবতা বিষয়ে মানুষের মনে এক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। সেই ভ্রান্ত ধারণাকে মানুষ আজ পর্যন্ত সত্য বলেই মনে করেন। সকলে দেবতা বলতে তেত্রিশ কোটি কাল্পনিক কোন ব্যক্তি বিশেষ কে বোঝেন; যারা কি না বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্র তথা বিভিন্ন স্বর্ণালংকারে ভূষিত রয়েছেন। সমাজে এই কাল্পনিক দেবতার বাস্তবিক ভিত্তি কতটুকু তা আমাদের অবশ্যই বিচার করা প্রয়োজন।

দেবতা কে ? সাধারণত দিব ধাতুর সাথে অচ্ প্রত্যয় করে দেব শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বিভিন্ন গ্রন্থে 'দেব' শব্দের অনেক অর্থ রয়েছে। যাস্কাচার্য তাঁর নিরুক্তগ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে বলেছেন- **"দেবো দানাদ্ বা, দীপনাদ্ বা, দ্যোতনাদ্ বা, দ্যুস্থানো ভবতীতি বা। (নি.৭।১৫)।"** অর্থাৎ দেবের লক্ষণ হচ্ছে দান। সবার হিতার্থে যিনি দান করেন, তিনি দেব শব্দ দ্বারা বোধ্য। দেবের গুণ হচ্ছে দীপন অর্থাৎ প্রকাশ করা। সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রকাশ করে বলে তাদের দেব বলা হয়। দেবের কর্ম হচ্ছে দ্যোতন অর্থাৎ সত্য উপদেশ প্রদান করা। অর্থাৎ যে মানুষ সত্য মানেন, সত্য বলেন এবং সত্য উপদেশ দান করেন তিনিই দেব। দেবের বিশেষতা হচ্ছে দ্যুস্থান অর্থাৎ উপরে স্থিতি লাভ। ব্রহ্মান্ডের উপরে স্থিতি লাভ করার জন্য সূর্যকে, সমাজের উপর স্থিতি লাভ করার জন্য বিদ্বান কে এবং রাষ্ট্রের উপর স্থিতি লাভ করার জন্য রাজাকে দেব বলা হয়।

এখন প্রশ্ন যে, এই দেব কত জন? বেদে স্পষ্ট রূপে উল্লেখ আছে যে, দেব তেত্রিশ জন।

"যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবা নিধিং রক্ষন্তি সর্বদা।
নিধিং তমদ্য কো বেদ যং দেবা অভিরক্ষথ।।" (অথর্ব ১০/৭/২৩)

যে এই [পরমেশ্বরের] সংসার কে তেত্রিশ দেব সর্বদা রক্ষা করছে। সেই সংসার কে আজ কে জানতে পারে, যাকে হে দেব! তুমি সর্বদা রক্ষাকারী হও।

বৈদিক সংস্কৃতিতে "কোটি" শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রকার। অর্থাৎ বিশ্বের মধ্যে দেব হচ্ছে তেত্রিশ প্রকার, তেত্রিশ কোটি নয়। তেত্রিশ কোটি দেবতার কল্পনা মিথ্যা এবং ভুল।

এই তেত্রিশ প্রকার দেবতা কে কে ? -এই প্রশ্নের উত্তরে বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে-

"অষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্ত একত্রিংশদিন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাবিতি।" (বৃ.উ.৩।৯।২)

অর্থাৎ অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য এই কয় জন মিলিয়া একত্রিশ এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি মিলিয়া তেত্রিশ-

অষ্ট বসু- **"অগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চ চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রাণি চৈতে বসব।" (বৃ. উ. ৩/৯/২)** অর্থাৎ অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক, চন্দ্র, নক্ষত্রপুঞ্জ ইহারা অষ্ট বসু। কারন নিখিল পদার্থ ইহাদের মধ্যে নিহিত আছে, সেই জন্য এদের নাম বসু।

একাদশ রুদ্র- **"দশমে পুরুষো প্রাণা আত্মৈকাদশস্তে।" (বৃ. উ. ৩/৯/৪)**
অর্থাৎ পঞ্চ প্রাণ এবং পঞ্চ উপপ্রাণ এই দশ এবং জীবাত্মা মিলে একাদশ রুদ্র। এই এগারো দেহান্তকালে রোদন করায় বলিয়া রুদ্র বলা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে-
পঞ্চ প্রাণ- প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান, অপান।
উপপ্রাণ- নাগ, কূর্ম, কৃকল, দেব (দেবদত্ত), ধনঞ্জয়। এছাড়াও জীবাত্মা নিয়ে হয় একাদশ রুদ্র।
দ্বাদশ আদিত্য- **"দ্বাদশ বৈ মাসাঃ...।" (বৃহঃ উপঃ ৩।৯।৫)**
সম্বৎসরে বারোটি মাস আছে, ইহারাই আদিত্য নামে পরিচিত। কারণ এই বারোটি মাসই এই সমস্তকে আদান করে যান। যেহেতু এই সমস্ত কে আদান করে যান, অতএব তারা আদিত্য নামে পরিচিত। দ্বাদশ আদিত্য হচ্ছে- চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্রপদ, আশ্বিন, কার্ত্তিক, মার্গশীর্ষ, পৌষ, মাঘ এবং ফালগুন।
ইন্দ্র- **"স্তনয়িত্নুরেবেন্দ্রো।" (বৃহঃ উপঃ ৬/১/৬)** অর্থাৎ বিদ্যুৎ হচ্ছে ইন্দ্র। কারন ইহা ঐশ্বর্যের সাধন গতি শক্তি, প্রকাশ, সমৃদ্ধি এবং সুখের সাধন প্রাপ্ত হয়।
প্রজাপতি- **"যজ্ঞঃ প্রজাপতিরিতি।" (বৃহঃ উপঃ ৬/১/৬)** যজ্ঞ হচ্ছে প্রজাপতি। কারন ইহার দ্বারা বর্ষা হয়, প্রাণীদের সুখ প্রাপ্তি হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে-

"অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ।। (গীতা. ৩/১৪)"

অন্ন ভোজন করে প্রাণীগণ জীবনধারণ করেন, বৃষ্টি থেকে অন্ন উৎপন্ন হয়। যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা বৃষ্টি উৎপন্ন হয় এবং শাস্ত্রোক্ত কর্ম থেকে যজ্ঞ উৎপন্ন হয়। এই প্রকারেই এটি প্রাণীদের জীবন ও সুখের আধার।

বেদের উল্লেখিত দেবতাগুলো কি ?

বেদের প্রত্যেকটি মন্ত্রেরই এক বা একাধিক দেবতা রয়েছে। পবিত্র বেদ সম্বন্ধে অজ্ঞানতার কারণে আমরা অধিকাংশ মানুষ মনে করে এগুলো হল মানুষ আকৃতির বিভিন্ন দেবতা, যাদেরকে ওই মন্ত্রটিতে স্তুতি করা হয়েছে। অথচ এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের বাণীতে তথা বেদে এরকম কোন দেবতাই নেই। এখন মনে প্রশ্নের উদয় হবে, তাহলে প্রত্যেকটি মন্ত্রের সাথে উল্লেখিত এই দেবতাগুলো কি?

আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে বেদের অধ্যয়সূচী (Index) যাতে প্রত্যেকটি মন্ত্রের অধ্যায়, সেই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি এবং সেই মন্ত্রের দেবতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে তাকে বলা হয় অনুক্রমণি। এরকম বেশ কয়েকটি অনুক্রমণির মধ্যে ঋষি কাত্যায়ন এর সর্বানুক্রমণি সবচেয়ে খ্যাতনামা বলে বিবেচিত। এই সর্বানুক্রমণিতে ঋষি কাত্যায়ন মন্ত্রের দেবতা কি তার ব্যখ্যায় বলেছেন- **"যা তেন উচ্চতে সা দেবতা"** অর্থাৎ মন্ত্রের যে বিষয়বস্তু অর্থাৎ যা নিয়ে মন্ত্রে কথা বলা হয়েছে, তাই ওই মন্ত্রের দেবতা। মহর্ষি যাস্কাচার্য রচিত নিরুক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে- **"যৎতাম ঋষির্যেস্যাং দেবতাযামার্থপত্যম্ ইচ্ছ স্তুতিং প্রযুক্তেতম্ দেবতঃ স মন্ত্রো ভবতি।।"** অর্থাৎ যখন ঈশ্বর কোন একটি বিষয়ের সম্বন্ধে আমাদের মন্ত্রের মাধ্যমে শিক্ষা দেন তখন মন্ত্রের সেই বিষয়টিকে দেবতা বলা হয়। উদাহরণ স্বরুপ ঋগ্বেদ ১০/১৫১ এর দেবতা হল শ্রদ্ধা এবং এই সুক্তের আলোচ্য বিষয় হল ঈশ্বর ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্মান জ্ঞাপন। ঋগ্বেদ ১০/১১৭ এর দেবতা হল 'ধনদানপ্রশাংসা' এবং এই সুক্তের মন্ত্রসমূহের আলোচ্য বিষয় হল গরীব দঃখীদের দানে উৎসাহিত ও

উদ্বুদ্ধ করা। ঋগেদ ১০/১৪৬ এর দেবতা হল 'দ্যুতনিন্দা' এবং তাই এর আলোচ্য বিষয়বস্তু হল জুয়া খেলার অপকারিতা ও নিষিদ্ধতা। ঋগ্বেদ ১০/৩৪ এর দেবতা হল 'অক্ষসমূহ' এবং তাই এর আলোচ্য বিষয়বস্তু হল জুয়া খেলার অপকারিতা ও কৃষিকার্যের প্রতি মনোনিবেশ। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ডলের প্রথম সূক্তের দেবতা হলো 'অগ্নি'। বিভিন্ন বিদেশি মিশনারিদের অপপ্রচারের কারণে একে সবাই নির্দিষ্ট আকৃতি যুক্ত আলাদা একটি দেবতা মনে করেন, যদিও তা সম্পূর্ণ ভুল।

ব্যবহারের দেব- মাতা, পিতা, আচার্য, অতিথি এবং পতি-পত্নী দ্বারা সংসারে ব্যবহার সিদ্ধ হয়, তাই এই পাঁচজনকেই ব্যবহারের দেবতা বলা হয়। তৈতরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে- **"মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব।" (তৈ.উ. ১/১১/২)**

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে- **"উপচর্যঃ স্ত্রীয়া সাধ্ব্যা সততং দেব পতিম্।" (মনু. ৫/১৫৪)**

উপরের বর্ণিত যে তেত্রিশ প্রকার দেবের বর্ণনা করা হলো। তাদের থেকে সুখ যেমন প্রাপ্ত হয় ঠিক একই ভাবে দুঃখও প্রাপ্ত হয়। অগ্নি দেব কিন্তু অনেক সময় সবকিছু জ্বালিয়ে দেয়, অতিথি দেব কিন্তু পরবর্তিতে শত্রুও হতে পারে। রাজা দেব কিন্তু কুপিত হয়ে দুঃখদায়ী হতে পারে। দেবতা রূপে সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবীদের সদুপযোগ করা তথা শ্রদ্ধা ও সম্মান করা উচিত। মাতা, পিতা, আচার্য এবং অতিথির সেবা করা ধর্ম। পূর্বজ মহাপুরুষের পথ অনুসরণ, সংবিধান পালন এবং দেশের রক্ষা করা মানুষের কর্তব্য। কিন্তু এরা কোন উপাস্য দেব নয়। উপাস্য দেব কেবল পরমাত্মা, কারন পরমাত্মাই সবার ইষ্ট দেব। এই সৃষ্টির সব কাল এবং পরিস্থিতির মধ্যে পূর্ণতম দেব এক এবং সেই পরমাত্মা। সেই জন্য অথর্ববেদে বলা হয়েছে-

"মা চিদন্যদ্বি শংসত সখায়ো মা রিষণ্যত।
ইন্দ্রমিৎস্তোতা বৃষণং সচা সুতে মুহুরুকা চ শংসত।।" (অ. বে. ২০/৮৫/১)

অর্থাৎ "হে মিত্র! পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কাহারো স্তবন করো না। সর্বদা প্রভুকে (পরমাত্মাকে) স্মরণ করতে করতে তুমি কাম, ক্রোধাদি দ্বারা শত্রুর প্রতি হিংসা প্রকাশ করো না। কখনও দুঃখী হয়ো না। এই উৎপন্ন জগতের সাথে মিলে সেই শক্তিশালী শত্রুর নাশকারী প্রভুর স্তুতি করো এবং বারংবার উক্ত স্তোত্রের স্তবন করো। সেই স্তুতিই তোমাকে শক্তিশালী করবে এবং তোমাকে বাসনাদি রোগ থেকে মুক্ত করবে।" অর্থাৎ আমাদের শুধু সেই এক পরমাত্মার উপাসনা করা উচিৎ, যা ওঙ্কার দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। তাই কঠোপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে বলেছেন-

"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ।।" (ক. উ. ১/২/১৬)

-এই অক্ষরটিই (ওঙ্কার) সর্বগত ব্রহ্ম, এই অক্ষরই সর্বাতীত ব্রহ্ম, এই অক্ষরকে জানতে পারলে যে যা চায়, সে তা প্রাপ্ত করে।

প্রবন্ধ

সংস্কৃত সাহিত্যে শরৎঋতুর সৌন্দর্যতা

সুপ্রভা দে কুন্ডু (অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ)

আমাদের দেশ হল ঋতু বৈচিত্র্যের দেশ। এই ঋতু বৈচিত্র্যে রয়েছে ছয়টি ঋতু। বৈচিত্র্যেময় ষড়ঋতুতে এক এক সময় প্রকৃতি একেক রূপ ধারণ করে। কোনো ঋতুর ছোঁয়ায় প্রকৃতি সতেজ হয়ে ওঠে তো কোনো ঋতুতে প্রকৃতি নিথর হয়ে পড়ে, আবার কোন ঋতুতে নিথর প্রকৃতি ফিরে আসে তার সজীবতায়।

বাংলার ঋতু বৈচিত্রে শরৎ ঋতু অন্যতম। ঋতু পরিক্রমায় শরৎ এর অবস্থান তৃতীয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুর পরে প্রকৃতিতে শরতের আগমন ঘটে। শরৎকাল হলো শুভ্রতার প্রতীক। শরতের আগমনে প্রকৃতি তার উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে। শরতের মেঘলা নীল আকাশে কাশ ফুলের মত গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা মেঘ উড়ে বেড়ায়।

প্রকৃতি যে মধুর মূর্তি নিয়ে হাজির হয়, সেই মূর্তি প্রকাশ করা যায় শুধু কাব্যের ভাষায়। শিল্প-সাহিত্যে, গানে-কাব্যে শরৎবন্দনার শেষ নেই। শরৎবধূর এ প্রণয়গাথা সকল দেশে সকল কালেই সমান মুগ্ধতা নিয়ে রচিত হয়েছে । সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবিরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে শরতের বর্ণনা দিয়েছেন। স্বাদে তা আলাদা হলেও বর্ণনার উপাদানসমূহে মোটামুটি অভিন্ন । যেমন আদি কবি বাল্মীকি তার রচিত রামায়ণ মহাকাব্যে সুন্দর ভাবে শরৎকালের বর্ণনা করেছেন।

পরবর্তীকালে মহাকবি কালিদাসের রচিত রঘুবংশ ও ঋতুসংহার মহাকাব্যেও শরতের এক অপূর্ব চিত্র দেখতে পাই। এছাড়াও মহাকবি ভারবি রচিত কিরাতার্জ্জুনীয়ম্ মহাকাব্যে শরদ্বর্ণনা দেখতে পাই। আলঙ্কারিক আচার্য রাজশেখর তাঁর কাব্যমীমাংসা অলংকারগ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে কালবিভাগ প্রসঙ্গে শরৎ ঋতুর বর্ণনা করেছেন।

আদি কবি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ মহাকাব্য ভারতবাসীর কাছে গৌরব। এখানে কবি রামায়ণ মহাকাব্যের কিষ্কিন্ধাকান্ডে রামচন্দ্রের মুখ দিয়ে শরৎ ঋতুর একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ষার অবসানে শরৎ ঋতুর আবির্ভাব ঘটেছে এবং তার প্রভাবে সমগ্র প্রকৃতি কিরূপ পরিবর্তন ঘটেছে তারই একটি সুন্দর ভাষাচিত্র লক্ষণ এর কাছে রামচন্দ্র তুলে ধরেছেন - উবাচ লক্ষণং রামো মুখেন পরিশুষ্যতা । (সীতার কথা স্মরণ করতে করতে রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষণকে বলেছিলেন।)

পদ্মপলাশাক্ষী সীতাকে হারিয়ে রামচন্দ্র সীতার চিন্তায় মগ্ন থেকে মলিন বদনে শরৎকালীন সৌন্দর্য বর্ণনার ছলে নিজের সীতা বিরহ জনিত মনোব্যথাকে অপূর্ব ব্যঞ্জনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। সহস্রলোচন ইন্দ্র বর্ষা ঋতুতে পৃথিবীকে পরিতৃপ্ত করে এবং শস্যসমূহ উৎপন্ন করে কৃতকার্য হয়ে অবস্থান করছেন ।

"নীলোৎপলদলশ্যামাঃ শ্যামীকৃত্বা দিশোদশ।
বিমদা ইব মাতঙ্গা শক্তিবেগাঃ পয়োধরাঃ।।"

অর্থাৎ অত্যন্ত গম্ভীর শব্দকারী মেঘগুলো পর্বত ও বৃক্ষসমূহ কে আচ্ছাদনপূর্বক বারি বর্ষণ করে শরতের

আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নীল পদ্মের পাপড়ির মতো শরতের মেঘগুলি দশদিক শ্যাম বর্ণ করে মদশূন্য হস্তির মতো শান্ত বেগ হয়ে পড়েছে।

কূটজ ও অর্জুন ফুলের গন্ধ বিশিষ্ট অত্যন্ত বেগশালি জলপূর্ণ মেঘগুলি বর্ষাকালে বারি বর্ষণ করে এখন শান্ত হয়ে গেছে। মেঘ ,হস্তি , ময়ূর এবং প্রস্রবণগুলির ধ্বনিও হঠাৎ শান্ত হয়ে গেছে।বিচিত্রশিখর বিশিষ্ট নির্মল পর্বতগুলি মহামেঘ দ্বারা ধৌত হয়ে যেন চন্দ্র রশ্মি দ্বারা অনুলিপ্ত হয়ে শরতে প্রতিভাত হচ্ছে।

"অভিবৃষ্টা মহামেঘৈর্নির্মলাশ্চিত্রসানবঃ।
অনুলিপ্তা ইবাভান্তি গিরয়শ্চচন্দ্ররশ্মিভিঃ।।"

শারদলক্ষ্মী তার সৌন্দর্যকে ভাগ করে দিয়েছে, সপ্তচ্ছদবৃক্ষের শাখায়, নক্ষত্র সূর্য ও চন্দ্রেরপ্রভায় এবং উৎকৃষ্ট হস্তী গুলির বিলাসে। শরতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিশাল নদীগুলির বেলাভূমিতে অবতীর্ণ কামক্রীড়াপ্রিয় চক্রবাক পক্ষীরা পদ্মবনে বিচরনহেতু পদ্মপরাগে রঞ্জিত দেহ নিয়ে হংসদের সাথে খেলা করছে।

"অভ্যাগতৈ শ্চারুবিশালপক্ষৈঃ স্মরপ্রিয়ৈঃ পদ্মরাজহবকীর্ণৈঃ।
মহানদীনাং পুলিনোপঘাতৈঃ ক্রীড়ন্তি হংসাঃ সহ চক্রবাকৈঃ।।"

শরতকালের অপরুপ শোভা হস্তিদের মধ্যে, দর্পিত বৃষগুলির মধ্যে এবং স্বচ্ছ সলিলা নদী গুলিতে শারদসৌন্দর্য নানাভাবে প্রতিভাত হচ্ছে।

"মদপ্রগলভেষু চ বারণেষু গবাং সমূহেষু চ দর্পিতেষু।
প্রসন্নতোয়াসু চ নিম্নগাসু বিভাতি লক্ষ্মসমীহুধা বিভক্তা"।।

প্রকৃতির বস্তুর মধ্যে যেমন শরৎ সৌন্দর্য বিকশিত হয়ে উঠেছে তেমনি কোন কোন প্রাণীর মধ্যে নিরানন্দেরও সঞ্চার হয়েছে। মেঘহীন আকাশে ময়ূরেরা পেখম না মেলে প্রিয়ার প্রতি অনাসক্ত বসত ধ্যানৎপরা হয়ে তপস্বীর মতো বনে বাস করছে। প্রিয়তমা হস্তী ধ্বনির মতো ছাতিম ফুলের গন্ধে উন্মাদ কামভোগ সম্পন্ন মদমত্ত হস্তিগুলির গতি মন্দ হয়েছে।

শরতের আকাশ নির্মল স্বচ্ছ, নদীর জল ক্ষীণধারায় প্রবাহিত হচ্ছে, পদ্মগন্ধে সুবাসিত বাতাস মৃদুমন্দ গতিতে বইছে, এবং দিকসমূহ অন্ধকারমুক্ত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে।

"কহ্লারশীতাঃ পবনাঃ প্রবান্তি তমো বিমুক্তাশ্চ দিশঃ প্রকাশাঃ"।।

হাঁসগুলি কর্দমশূন্য বালুকাময় স্বচ্ছলীলা নদীগুলিও আনন্দচিত্তে লাফিয়ে পড়ছে। স্তব্ধ হয়েছে নির্ঝরের ধ্বনি বায়ুর গর্জন ও ভেকেদের ডাক। দীর্ঘদিন অনাহারে কাটিয়ে মৃতপ্রায় বিষধর সর্পগুলি পুনরায় গর্তের বাইরে খাদ্যের অন্বেষণে বেরিয়ে আসছে।

শরতের দৃষ্টি নন্দন রাত্রিকে আদি কবি নারীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। গগনে উদিত চন্দ্র নারীর মুখ,নক্ষত্রগুলি হল স্বচকিত দৃষ্টি এবং শুভ্র জ্যোস্না, শুভ্র বসন । সুপক্ষশালী ধানগুলি ভক্ষণ করে আনন্দিত দ্রুতগতি সম্পন্ন সারসশ্রেণী বাতাসে কম্পিত গাঁথামালার মতো গগন মন্ডলে অতিক্রম করছে।

"বিপক্কশালিপ্রসবানি ভুক্ত্বা প্রহর্ষিতা সারসচারুপংক্তিঃ।
নভঃ সমাক্রামতি শীঘ্রবেগা বাতাবধূতা গ্রথিতেব মালা"।।

শরতের কুমুদশোভিত বিশাল সরোবরগুলি রাত্রিতে নক্ষত্রখচিত আকাশের মত শোভা পাচ্ছে এবং হাঁসগুলিকে মেখলার সঙ্গে এবং পদ্মগুলিকে মালার সঙ্গে চিন্তা করলে শরতের দীর্ঘিকা যেন অলঙ্কৃতা বারবধুর

শোভা ধারণ করেছে। শরৎ প্রাতে বাঁশির ধ্বনি, গাভী এবং বৃষের ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে যেন ঐকতান সৃষ্টি করেছেন? নদীর তীরগুলি বায়ুর হিল্লোলে কম্পিত শুভ্রকাশকুসুমে আচ্ছন্ন থাকায় মনে হচ্ছে যেন ধৌত বিমল পট্ট বস্ত্র পরিধান করেছে।

বর্ষার অবসানে শরৎ ঋতুর আগমন ঘটেছে এই কথাটি বলে দিচ্ছে নির্মল জল পুষ্পসমূহের বিকাশ, ক্রৌঞ্চ পাখির ডাক , সুপক্ক শালীগণ মৃদুমন্দ বাতাস এবং নির্মল চন্দ্র এ সবই বলে দিচ্ছে শরৎ এর সমাগম।

"জলং প্রসন্ন কুসুমপ্রহাসং ক্রৌঞ্চস্বনং শালিবনং বিপক্কম্।
মৃদুশ্চ বায়ুবিমলশ্চ চন্দ্রঃ শংসতি বর্ষব্যপনীতকালম্"।।

শরতের নদীগুলি গোরোচনা হলুদ চর্চিত শুভ্রবস্ত্র দ্বারা অনাবৃত বধূ মুখের ন্যায় শোভা পাচ্ছে। পরিশেষে রামচন্দ্র শরতকে বিরোধীদের দন্ডদাতা রূপের চিহ্নিত করেছেন। বর্ষার যে জলপূর্ণ মেঘগুলি সুবৃষ্টির দ্বারা সকলকে তৃপ্ত করে নদী জলাশয়গুলিকে পূর্ণ করে ধরনীকে শস্য শ্যামল করে শরতের আগমনে গগন মন্ডল ত্যাগ করে চলে গেছে।

"লোকং সুবৃষ্ট্যা পরিতোশয়িত্বা নদীস্তটাকানি চ পূরয়িত্বা।
নিষ্পন্ন শস্যং বসুধাং চ কৃত্বা ত্যক্ত্বা নভস্তোয়ধরাঃ প্রণষ্টাঃ"।।

এভাবে রামচন্দ্র শরৎলক্ষ্মীর অপরূপ বর্ণনা লক্ষণের কাছে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। আদি কবির এই শরৎবর্ণনা পরবর্তীকালে মহাকাব্যিকদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আদিকবির এই শরদ বর্ণনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মনোরম।

প্রবন্ধ

বর্তমান যুগের খেলাধুলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

অর্ঘ্য নায়ক (অধ্যাপক, শারীর শিক্ষা বিভাগ)

ভূমিকা:- প্রাচীনকাল থেকে সমাজে মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকে যে খেলাধুলার মাধ্যমে স্বাস্থ্যরে উন্নতি ঘটে এবং শিশুর বিকাশ সাধন হয়। তাই এই খেলাধুলায় শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক দিক দিয়ে প্রাণ উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় করার জন্য একমাত্র মাধ্যম হলো খেলাধুলা। খেলাধুলার মাধ্যমে একজন শিশুর সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত যা তাদের শারীরিক মানসিক বিকাশের সাহায্য করে এবং পাশাপাশি শিশুর মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। তাই প্রতিটি শিশুর প্রতিনিয়ত খোলা আকাশের নিচে উন্মুক্ত পরিবেশে খেলাধুলা করা অপরিহার্য।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে-

"দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারেনা। আমাদিগকে উহা বদলাইয়া সবল মস্তিষ্ক হইতে হবে।
তোমরা সবল হও, গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমার স্বর্গের সমীপবর্তী হইবে।"

খেলাধুলার উদ্ভব:- খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার বছরের আগেও কুস্তি খেলার প্রথম সূচনা হয় ইরাকে। খ্রিস্টপূর্ব ২০৫০ বছর আগেও মিশরের শুরু হয় হকি খেলা। এছাড়াও ৭৭৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রাচীন গ্রিসে প্রাচীন অলিম্পিক খেলার সূত্রপাত হয়। সেই বিশাল প্রতিযোগিতায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া কুশলীরা মল্লযুদ্ধ সোজা পথের দৌড়, মুষ্টি যুদ্ধ কুস্তি, ছড়া, বর্ষা নিক্ষেপ প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এবং এবং পরবর্তীকালে যখন আধুনিক অলিম্পিক হয় সেক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বিষয়ে বেশ কিছু পরিবর্তন হয়। এবং অসংখ্য খেলার উদ্ভব ঘটে এবং সেক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয় এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে।

খেলাধুলার বিভক্তিকরন:- প্রতিটি দেশের উপজাতি নানা ধরনের খেলার সাথে সংযুক্ত। তাহলে খেলাশধ পর্যায়ক্রমিক হিসাবে দুটি ভাগে ভাগ করার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

১. ইনডোর গেম - ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, টেবিল টেনিস প্রভৃতি
২. আউটডোর গেম - ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি

খেলাধুলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

শারীরিক গঠনে খেলাধুলা:- মানুষের খেলাধুলা মানুষের শরীর ও মনকে সতেজ করে। "স্বাস্থ্যই সম্পদ", আর সুস্থ শরীরে মানুষকে দান করতে পারে উত্তম উদ্দীপনা, সঠিক দেহ ভঙ্গিমা, সুষম শারীরিক গঠন ও,দেহের পেশী গঠনে খেলাধুলার ভূমিকা অপরিহার্য। সুস্থ শরীর ও মনের যে শক্তি সুদৃঢ় বুনিয়াদ রচনা করে দেয় তাতে মানুষের পরবর্তীকালে জীবনযুদ্ধে মনোবল হারিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য অর্জন করে।

মানসিক উন্নয়নে খেলাধুলা:-

মানসিক উন্নয়নের জন্য খেলাধুলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছোট থেকে খেলাধুলা ও আনন্দময় পরিবেশের সংস্পর্শে বেড়ে উঠলে শিশুর মন হয় উজ্জ্বল ও আনন্দময়। তাই দেখা গেছে একজন শিশুকে পুতুল খেলতে না দিলে বয়স্ক মানুষের সাথে আবদ্ধ হলে সে ক্ষেত্রে শিশু অভিমানী ও বদমেজাজি হয়ে ওঠে। তার সাথে সাথে মানসিক বিকাশ হয় না। খেলাধুলা অনেক ক্ষেত্রে মানসিক দুশ্চিন্তা লাঘবের উপায় তাই খেলাধুলার মাধ্যমে মানসিক ও বহুদিক

বিকাশ উন্নতি ঘটে।

খেলাধুলা ও চরিত্র গঠন:- খেলাধুলা মানুষের চরিত্র গঠনের সাহায্য করে। বিভিন্ন খেলাধুলার নিয়ম-কানুন বিভিন্ন রকমের হয়। এই নিয়ম-কানুন মেনে চলতে গিয়ে খেলোয়াড়রা শেখে নিয়মানুবর্তিতা ও সততা। খেলার মাঠের মতো জীবনের প্রাঙ্গণে সাফল্যের জন্য আছে প্রতিযোগিতা আছে বিজয় উল্লাস ও পরাজয়ের গ্লানি আছে শান্ত চিত্তে তা মেনে নেওয়ার ক্ষমতা। খেলার মাধ্যমে যে সংগ্রহ করে জীবনের শ্রেষ্ঠ আচরণ দীক্ষা। একদিকে যেমন তার চরিত্র বিকশিত করে অপরদিকে তেমনি পরাজয়ের সহনশীলতা ও হৃদয়ের উদারতা।

খেলাধুলা ও শৃঙ্খলা:- শৃঙ্খলা শুধু ব্যক্তি নয় সমগ্র দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নতি এক হাতিয়ার। খেলাধুলায় পারে একজন খেলোয়াড় কে শৃঙ্খলা বোধের আবদ্ধ করন। শৃঙ্খলা পারে খেলোয়াড়ের দলগত ঐক্যবোধের চেতনার উন্মেষ ঘটাতে। খেলাধুলা যখন গোটা দল সর্বশক্তি উজাড় করে দেয়, জয়ের প্রত্যাশায় ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিপক্ষের উপর একক নৈপুণ্যের প্রদর্শন নয়, দলগত সংস্থায় প্রধান আর এই দলগত শৃঙ্খলা বোধি জাতিকে অগ্রগতির অন্যতম ভিত্তি

শিক্ষায় খেলাধুলা:- জীবন গঠনের সূচনায় সব প্রাণীর ক্ষেত্রে খেলাধুলার শিক্ষার উপায়। ছাত্র ছাত্রীদের বিদ্যা শিক্ষা কে চিত্ত আকর্ষণ করতে এবং পাঠ্য বিষয়ক বিষয়বস্তুর প্রচন্ড চাপ লাঘব করতে শিক্ষার সাথে সাথে খেলাধুলার গুরুত্ব কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই খেলাধুলার মাধ্যমেই মানসিক বিকাশ সামাজিক বিকাশ, বুদ্ধি বিকাশ উন্নতির ঘটে। তাই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র- ছাত্রীদের ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা ব্যবস্থা থাকে, আজকাল খেলাধুলায় ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

সুস্বাস্থ্য উন্নয়ন বৃদ্ধিতে খেলাধুলা:- মানবজাতি আজকে খেলাধুলার মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যের উন্নতি গঠনের মুখ্য ভূমিকা পালন করে। স্বাস্থ্যই হলো সুখের মূল চাবিকাঠি। রবীন্দ্রনাথ বলেছে-"চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু" তাই খেলাধুলার মাধ্যমে যেমন একজন শিশুর সুস্থ শরীর গঠন করে তেমনি শরীরের কোষগুলি পুষ্টি সাধন রক্ত চলাচল ও পৌষ্টিক তন্ত্রের কার্যক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রতিনিয়ত কোন না কোন খেলাধুলা গুরুত্ব অপরিসীম।

খেলাধুলার গুরুত্ব:- শিশুর জীবনে খেলাধুলা গুরুত্ব অসীম ও অপরিহার্য। শিশু ও মনের সতেজ রাখার পাশাপাশি দেহ পেশী গঠনের সহায়তা করে এবং মানসিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ ও বুদ্ধির বিকাশে গঠনের সাহায্য করে। তাই শিশু জীবন যুদ্ধের মনবল কে হারিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় এবং একজন শিশুকে মানুষ হিসাবে নাগরিক গড়ে তোলে।

উপসংহার:- খেলাধুলা যেমন শরীর গঠনের সহায়ক তেমনি খুবই আনন্দদায়ক। প্রতিটি খেলাধুলায় থাকে কর্তব্যবোধ দায়িত্বশীল ও শৃঙ্খলাবোধ তেমনি অন্য দিকে থাকে পায় মর্যাদা অর্জনের শিক্ষা। তাই এই খেলাধুলায় মানুষের মন ও শরীরের বিকাশ ঘটে তেমনি অন্যদিকে সুস্বাস্থ্য শৃঙ্খলা চারিত্রিক প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। তাই খেলার মাঠ মানুষের অন্তহীন সাধনার পিঠস্থান। তাই প্রত্যেক জীবনে খেলাধুলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অতি আবশ্যক।

"Sports make a man strong
Sports make a man livelong"

প্রবন্ধ

বিষ্ণুপুরের রক্তাক্ত ইতিহাস ও লালবাঈ।

বিবেকানন্দ সিংহ (শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ)

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজত্ব কালে লালবাঁধ ও যার নামের সঙ্গে এই বিরাট জলাশয়ের সম্পর্ক সেই রহস্যময়ী লালবাঈ এক জ্বলন্ত অধ্যায়। রূপকথার গল্পের মতো আজও লালবাঁধ জনমানসে কৌতুহল জাগায়। বহু দুঃস্বপ্নের স্মৃতি বিজড়িত বিরাট লালবাঁধ কিংবদন্তী হয়ে আজও ভাস্বর।

সময়টা মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহদেবের রাজত্বকাল। তাঁরই আমলে রচিত হয় বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ ইতিহাসে সবচেয়ে কালিমালিপ্ত অধ্যায় এক রহস্যময়ী নারীর আবির্ভাবে। সেই রহস্যময়ী নারী আর কেউ নয় তাঁর নাম লালবাঈ যার সঙ্গে রাজা রঘুনাথ সিংহের নাম ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

বিষ্ণুপুরের ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কিত অধ্যায়ের নাম যদি লালবাঈ হয় তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন আসবে কে এই লালবাঈ আর বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে কেনই বা সে কলঙ্কিত ? বিষ্ণুপুরের রাজকাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় দুর্ধর্ষ পাঠান নায়ক রহিমখাঁর সঙ্গীতনিপুণা, রূপসী লাস্যময়ী বেগম সাহেবা ছিলেন লালবাঈ। কিন্তু বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে তাঁর অনুপ্রবেশ কিভাবে ঘটেছিল সেটা নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সময়টা ১৭০২ খ্রীঃ। বিষ্ণুপুরের রাজসিংহাসনে আসীন হলেন রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ। তাঁর রাজত্ব কালে এক অদ্ভুত কারণে ধর্ম বিপর্যয়ের আশঙ্কা ঘনীভূত হয়। শেষ পরাক্রান্ত মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ পর্যায়ে বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল চন্দ্রকোনা অঞ্চলের চেৎবরদা পরগনার রাজা শোভা সিংহ এক প্রবল বিদ্রোহ ঘোষনা করে বসেন। শোভা সিংহের বিদ্রোহ সমর্থন করেন দুর্ধর্ষ পাঠান সর্দার রহিম খাঁ। বিদ্রোহীদের ক্ষমতা এতোটাই প্রবল ছিল যে তাদের রোষানলে সদ্য অধিষ্ঠিত বর্ধমান-আজমৎ শাহী অঞ্চলের রাজা এবং মুঘল অনুগত কৃষ্ণরাম রায় সপরিবারে নিহত হলেন। শোভা সিংহ এবং পাঠান রহিম খাঁর মিলিত আক্রমনের সম্মুখে পড়ে পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মুঘল আধিপত্য প্রশ্ন চিহ্নের মুখে পড়ে। ঢাকায় বসে সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ দিশেহারা হয়ে পড়েন। কিন্তু সাফল্যের চরম শিখরে পৌঁছেও ইন্দ্রিয়ের দোষে চালিত হয়ে বিদ্রোহী শোভা সিংহ নিহত কৃষ্ণরামের কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে অধিকার করতে গিয়ে ছুরিকাহত হয়ে নিজের জীবন হারিয়ে ছিলেন বলে আলিমুদ্দিনের- রিয়াস- উস- মালাতন গ্রন্থ হতে জানা যায়।

যাই হোক শোভা সিংহ ও রহিম খাঁর যৌথ আক্রমণে যখন বিষ্ণুপুর আক্রান্ত তখন অনেকেই মনে করেছিলেন যে বিষ্ণুপুরের পরাজয় শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু মহারাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ সকলকে ভুল প্রমাণিত করে তাঁর অসামান্য রণনিপুনতায় চেৎবরদা জয় করে তাকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে যুবরাজ থাকাকালীন রঘুনাথ সিংহদেবের সঙ্গে শোভা সিংহের কন্যা চন্দ্রপ্রভাদেবীর বিবাহ হয়েছিল এবং রাজা রঘুনাথ সিংহ তাকে জ্যেষ্ঠা মহিষীর মর্যাদা দিয়েছিলেন।

শোভা সিংহ ও রহিম খাঁর আক্রমন প্রতিহত করার পর রঘুনাথ সিংহ বিষ্ণুপুরে প্রত্যাবর্তন করতে মনস্থির

করেন। তাঁর সৈন্যরা রহিম খাঁর শিবির লুণ্ঠন করে সমস্ত ধনরত্ন হস্তগত করে। ধনরত্নের সঙ্গে রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্য উপহার হিসাবে রাজা রঘুনাথ সিংহের সৈন্যরা সঙ্গে নিয়ে আসে, রহিম খাঁর সঙ্গীত নিপুণা রূপসী বেগম লালবাঈকে। আর এই ভাবেই বিষ্ণুপুরের রাজ ইতিহাসে লালবাঈ-এর আবির্ভাব। তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরে ঘনীভূত হয় অসন্তোষের কালো ছায়া। সরল প্রাণ, উদারচেতা রাজা তাকে প্রথমে আশ্রয় দেন 'লালগড়' নামক ভবনে পরে তার জন্য নির্মিত 'নতুন মহল' বাসভবনে। আর এই ভাবেই লোক চক্ষুর অগোচরে বিষ্ণুপুরের বুকে রোপিত হয় তার সর্বনাশের বিষবৃক্ষ। রাজধানীর রঙ্গমঞ্চে ক্রমশ বলিষ্ঠ ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করলেন লালবাঈ।

সঙ্গীতপ্রিয় রাজা গান শোনার জন্য মাঝে মধ্যেই যেতেন লালবাঈ-এর নতুন মহল বাসভবনে। লালবাঈ-এর মোহমদির রূপ ও মন মাতানো সঙ্গীত ক্রমশ রাজাকে গ্রাস করে ফেলে। বিষ্ণুপুরের বুকে ঘনিয়ে আসে অমানিশার ঘন কালো রাত্রি। কি করে রাজাকে এই মোহাবর্ত থেকে মুক্ত করা যায় সকলের মনে সেই আশঙ্কা জাগ্রত হয়। ক্রমে ক্রমে বহু সদগুণের অধিকারী রঘুনাথ সিংহ পরিণত হয়ে পড়েন এক দুশ্চরিত্রা নারীর হাতের পুতুলে। শুরু হয় রাজাকে নিয়ে লালবাঈ-এর খেয়ালী খেলা। এখন আর মাঝে মধ্যে নয় সর্বক্ষণ রাজা মদিরাসক্ত হয়ে নতুন মহলে লালবাঈ-এর আঁচলে বাঁধা হয়ে পড়েন। পরম বৈষ্ণব বংশের রাজা সংস্কার ভুলে গিয়ে লালবাঈ-এর সঙ্গে মুসলমানী খানায় অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন। তার প্ররোচনায় রাজা খনন করেন বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে এক বিশাল দীঘি লালবাঈ-এর নামে যার নামকরন হয় লালবাঁধ। রাজা রঘুনাথ সিংহ প্রতিনিয়ত রক্ষিতা লালবাঈকে নিয়ে সেই লালবাঁধে নৌকাবিহার করতেন। নৌকাবিহার চলাকালীন লালবাঈ-এর সঙ্গীতে মগ্ন হয়ে থাকতেন। এইভাবে স্বেচ্ছাচার আর অনাচারের রোষ ধূমায়িত হয়ে বিদ্রোহে পরিণত হয়। অপুত্রক রাজা রঘুনাথ সিংহের এই অধঃপতনে প্রজাবর্গ তাঁর ভাই গোপাল সিংহ দেবকে রাজা ঘোষিত করে তাঁর বিরোধিতা করতে চাইলে ভাই-অন্তঃপ্রাণ গোপাল সিংহ প্রজাদের দাবী মেনে নেননি। পরন্তু লালবাঈ-এর চক্রান্তে গোপাল সিংহকে আত্মগোপন করতে হয়।

ইতিমধ্যে লালবাঈ-এর গর্ভে এক পুত্র সন্তান জন্ম নেয় আর সেই সন্তানকে উপলক্ষ করেই বিষ্ণুপুরের বুকে নেমে আসে বিধাতার অভিশাপ। সন্তানকে কেন্দ্র করে লালবাঈ-এর মনে যে পাপ বাসনা জাগ্রত হয় তা রাজ্যের হিন্দু প্রজাদের কাছে ছিল এক ভয়ঙ্কর ধর্ম বিপর্যয়ের বিষয়। হিন্দুদের পুত্র-কন্যা জন্মালে যেমন অন্নপ্রাশন হয় লালবাঙ্গের মনেও সেই বাসনা জাগ্রত হয়। রাজার চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের উপর সম্পূর্ণ অধিকার কায়েম করে লালবাঈ রাজাকে ও রাজ্য শুদ্ধ সকল প্রজাকে মুসলিম হয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। বোধশক্তি হীন, ইন্দ্রিয় পরায়ন রাজা রঘুনাথ সিংহ শুরুতে সামান্য আপত্তি জানালেও পরে সম্মত হতে বাধ্য হন। রাজার আদেশে সমস্ত প্রজাকে এত্তেলা পাঠানো হয়। শুরু হয় সেই মতো আয়োজন। মুসলমান বাবুর্চির রান্না করা খাবার নগরের সমস্ত প্রজাদের এক দুপুরে এক পংক্তিতে নিষিদ্ধ মাংস ভোজন করিয়ে জাতি ধর্ম নাশের অভিসন্ধি করে লালবাঈ।

প্রজাদের খাওয়ানোর জন্য বিরাট জায়গার ব্যবস্থা হয় যা 'ভোজন টিলা' নামে অভিহিত। নতুন মহল শ্মশানকালী মন্দির যাবার রাস্তার যেটি পড়ে। নির্দিষ্ট দিনে ভোজনালয়ে উপস্থিত হয়ে ভোজন গ্রহন করার জন্য চারিদিকে রাজাদেশ কঠোর ভাবে জারী করা হয়। ধর্ম সংকটে ভীত হয়ে সমস্ত প্রজারা রাজমাতা চন্দ্রপ্রভার শরণাপন্ন হয়। রাজ্যের এই চরম, দুর্দিনে মহারাণী চন্দ্রপ্রভা তার সর্বস্ব পণ করে এই পাপাচারের গতি রোধ করতে এগিয়ে আসেন। রাজকর্মচারীদের নির্দেশ দেন ছলে বলে কৌশলে রাজধর্ম রক্ষা করার। মহারাণীর জয়গানে সর্বত্র মুখরিত হয়ে ওঠে।

লালবাঈ-এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছালে আহত সাপিনীর মতো আক্রোশে গর্জে ওঠেন। রাজা রঘুনাথ সিংহও ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তাঁর আদেশ অমান্য করার জন্য নতুন মহলের বাসভবনে মহারাণী চন্দ্রপ্রভাকে তলব করেন। রাজার আদেশ পালন করার প্রয়োজন মহারাণী মনে করেন নি। ক্রুদ্ধ রাজা এই ধৃষ্টতার শাস্তি বিধানের জন্য সশরীরে রাজদরবারে উপস্থিত হন। কিন্তু মহারানীর নির্দেশ মতো কেউই রাজার সম্মুখে উপস্থিত হয় নি। অতঃপর মহারাণীর সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য রাজা রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। মহারাণী তখন হাওয়ামহলে অবস্থান করছিলেন। রাজা সোজা মহারাণীর কাছে উপস্থিত হন এবং জানতে চান রানীমা কেন রাজাদেশ লঙ্ঘন করেছেন। নির্ভীক রানীমা দৃঢ়কণ্ঠে রাজাকে তাঁর সর্বনাশা আদেশ প্রত্যাহার করার জন্য বারংবার অনুরোধ জানান। কিন্তু ক্রোধে উন্মত্ত রাজা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন।

বেজে উঠলো ধর্মের ভেরী। ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিরুপায় রাণী বেদনা নিষ্ঠুর পথই বেছে নেন। ইঙ্গিতে রাজ কর্মচারীদের নির্দেশ দেন শেষ উপায় অবলম্বনের জন্য। রাজার উপর আততায়ীদের আক্রমন চলে, আহত রাজা পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ঝাঁপ দেন নীচে থাকা হরিণ পিঞ্জরে। প্রচন্ড ক্ষতবিক্ষত হয়ে রাজা রঘুনাথ সিংহ প্রাণত্যাগ করলেন।

সারা রাজ্যে ফিরে এল স্বস্তির নিঃশ্বাস। কিন্তু পরক্ষণেই নেমে আসে হাহাকার, ঘটে যায় এক বেদনাঘন ঘটনা। সকলের কাতর অনুরোধ, ক্রন্দন উপেক্ষা করে রাজমহিষী চন্দ্রপ্রভা জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে সামিল হলেন। 'পতিঘাতিনী সতী' রূপে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো তাঁর খ্যাতি। সমগ্র বিষ্ণুপুর তখন উত্তাল শোকে, দুঃখে প্রজাবর্গ উন্মত হয়ে উঠে। তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে সব অনর্থের মূল লালবাঈ। সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ল তার উপর। প্রচন্ড ক্রোধে উন্মত্ত প্রজারা তার বাসভবন ভেঙ্গে চুরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। নির্মম ভাবে জলে ডুবিয়ে মারে লালবাঈকে। অনেকে মনে করেন প্রজাদের কাছে লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা হওয়ার ভয়ে তিনি লালবাঁধে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

১৮৯৮ খ্রীঃ লালবাঁধ পরিষ্কার করে তাকে ব্যবহারের উপযুক্ত করা হয়। লালবাঁধে মেলে মানুষের কঙ্কাল ও বহু মুসলমানী খাদ্যপাত্রের অস্তিত্ব। এইভাবে শেষ হয় বিষ্ণুপুরের ইতিহাসের এক রোমহর্ষক ও কলঙ্কিত অধ্যায়।

তথ্য - বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী - ফকিরানারায়ণ কর্মকার

প্রবন্ধ

বাঁকুড়ার লোকজীবনে শিক্ষার ভূমিকা

ড. তাপস মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

"অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীনপাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না- বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।" [১]

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন। একথা সত্য শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষায় আলোকিত না হয়ে, আমাদেরকে সর্বজনীন শিক্ষায় আলোকিত হতে হবে। এতেই আমরা হয়ে উঠবো পূর্ণাঙ্গ মানুষ। আর প্রত্যেক মানুষই জন্মানোর সাথে সাথে সহজাত প্রবৃত্তি হিসাবে বুদ্ধি পেয়ে থাকে। শিক্ষার মাধ্যমে সেই বুদ্ধির আরো বিকাশ লাভ সম্ভব। কারণ হিসাবে বলা যায়, যারা অশিক্ষিত, যাদের মধ্যে কোন রূপ পুঁথিগত শিক্ষা নেই অথচ তাদের সকলের মধ্যে একটা সহজাত বুদ্ধি বর্তমান। যেমন- জীবন- জীবিকা নির্বাহের জন্য যে বুদ্ধির প্রয়োজন তা অশিক্ষিত মানুষদের মধ্যে বর্তমান। এই সাধারন বুদ্ধির সঙ্গে যখন শিক্ষা নামক বুদ্ধি সংযুক্ত হয় তখন তা একটা পরিমার্জিত রূপ লাভ করে। এই শিক্ষাই আজ গৃহবাসী মানুষকে চাঁদে নিয়ে গেছে। তথাপি আজকের সমাজ থেকে আমরা প্রকৃত বা যথার্থ শিক্ষা পাই না। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা আজ মুখস্থ করে শিক্ষা নামক বৈতরনী পার হচ্ছে। একের পর এক ডিগ্রীর বোঝা লাভ করছে। ফলে শিক্ষাকে তারা কেবল বহন করেই চলেছে, বাহন করতে পারছে না। তাই তাদের বুদ্ধির বিকাশও সেভাবে ঘটছে না। কাজেই যতক্ষণ না তাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ততক্ষণ এর অগ্রগতি সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'শিক্ষা ও বিজ্ঞান' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থে জানিয়েছেন -

"বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাদানের অভাবের জন্যই আমাদের দেশে প্রকৃত জ্ঞানের আলো পৌঁছাতে পারে নি। তাই আজও আমরা কুসংস্কারের ঘেরাটোপে বন্দী হয়ে আছি"[২]

শিক্ষিত সমাজ আজও জ্যোতিষী বিশ্বাস, মাদুলি, মন্ত্রতন্ত্র নানারকম কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তাই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা এ সকল সমস্যা দূর করতে হবে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সাথে ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি আনন্দ যদি এতে যোগ হয় তাহলে সে শিক্ষা সার্থক রূপ লাভ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে রাজশেখরের একটি উক্তি গ্রহনযোগ্য। তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি নামক গ্রন্থে বলেছেন--

" জগতের শিক্ষিত জন যদি সকল ক্ষেত্রে এই প্রকার উদার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রয়োগ করতে শেখেন তবে কেবল সাধারন ভ্রান্ত সংস্কার দূর হবে না, ধর্মান্ধতা ও রাজনৈতিক সংঘর্ষেরও অবসান হবে।"[৩]

শিক্ষায় থাকবে মানুষের কল্পনার সঙ্গে বাস্তবযোগ আর স্বাধীন ইচ্ছা। অথচ বর্তমানে দেখা যায় শিক্ষার্থীর বাবা মা তার সন্তানের পিঠে জোর করে বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দেয় যাতে competition এ তার ছেলে বা মেয়েটি First হতে পারে। কিন্তু সেই শিশুটির যে একটা স্বাধীন ইচ্ছা, কল্পনার রাজ্য থাকতে পারে তার বাবা মা তা বুঝতেও চায় না। ফলস্বরূপ শিশুটির সর্বাঙ্গীন বিকাশ ব্যহত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তোতাকাহিনীতে যান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার এরকম সমালোচনা করেছেন। সেখানে আমরা দেখি একটা পাখিকে কৃত্রিম শিক্ষা দেওয়ার ফলে পাখিটার মৃত্যু ঘটেছে। আজকের সমাজেও শিশুরা যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার চাপে তার কল্পনার শৈশব হারিয়ে ফেলছে।

'শিক্ষার হেরফের' নামক গদ্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠিক একই কথা বলতে চেয়েছেন --

"আমাদের নীরস শিক্ষায় জীবনের সেই মহেন্দ্রক্ষণ অতীত হইয়া আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলো কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি, পৃষ্ঠের মেরুদন্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গিন বিকাশ হয় না।"[৪]

এই শিক্ষা অর্জনের ব্যাপারে স্ত্রী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার। কিন্তু অতীতের দিকে চোখ রাখলে দেখা যায় তখনকার দিনে মেয়েদের বা নারীদের শিক্ষা অর্জনের অধিকার ছিল না। মেয়েরা ছিল তখন অন্তঃপুরবাসিনী। তাদের বেশিরভাগ সময় ঘরে বন্দি থাকতে হত। অতএব বাইরে বেরিয়ে শিক্ষা অর্জনের অধিকার ছিল না। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় প্রথম নারীরা শিক্ষা অর্জনের অধিকার পেল; এর ফলস্বরূপ তাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন এল। নারীরা তখন আর অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে থাকল না। সাহিত্য, শিল্প সংস্কৃতিতে (নারিদের) অবাধ প্রবেশ হল। এই স্ত্রী-শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্ত্রী শিক্ষা' প্রবন্ধে বলেছেন-

"যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে পুরুষে পার্থক্য নাই। কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে।" [৫]

লোকজীবনেও এই শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করতে হবে। বর্তমানে দেখা যায় লোকজীবনে গ্রামগঞ্জের অল্পবয়স্ক শিশুরা শহরের নানা ক্ষেত্রে নানা কাজের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছে অভাবের তাড়নায়। ফলে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হতে হয় তাদের। কাজেই সেই সকল শিশুদের প্রথমত শিক্ষিত করে দেশ ও দশের কাজের উপযুক্ত করে তুলতে হবে। কারণ শিশুরাই দেশের ভবিষ্যত। এদের মধ্যে একটা অসাধারন শক্তি আছে। এরা যে কোন সমস্যার সমাধানের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার এরাই শিক্ষিত হয়ে নিজেদের সমাজ, গ্রাম ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করে। তাই এরা শিক্ষিত না হলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়।এ প্রসঙ্গে আমরা সত্যেন্দ্রনাথের 'কুহু ও কেকা' কাব্যগ্রন্থের 'ছেলের দল' কবিতাটির কথা স্মরণ করতে পারি --

"ওই যে দুষ্টু, ওই যে চপল-ওই আমাদের ছেলের দল
ওরাই রাখে জ্বালিয়ে শিখা বিশ্ব বিদ্যা শিক্ষালয়ে।" [৬]

শুধুমাত্র শিশুদেরই নয়, অশিক্ষিত গ্রামগঞ্জের মানুষদেরও শিক্ষা দিতে হবে। তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে তাদের দৈনন্দিন জীবনধারনের ক্ষেত্রে কোথাও কোন রকম অসুবিধার সম্মুখিন তারা না হয়। আসলে শিক্ষা এমন এক জিনিস যা মানুষকে কর্মে উদ্দিপিত করে এবং সত্য ন্যায়বাদী, কর্তব্য নিষ্ঠা পরায়ন করে তোলে। কিন্তু শিক্ষিত না হলে মানুষ নানা রকম অসৎ কাজে প্রবৃত্ত হয়। কারন যে কোন উপায়েই তো জীবনধারন করতে হবে। অতীতে দেখা যেত লোকজীবনের মানুষেরা কোন মন্দির প্রাঙ্গণে জড়ো হয়ে কথক ঠাকুরের মুখে রামায়ণ,মহাভারত ও নানা শাস্ত্রীয় গল্প শুনে লোকশিক্ষা লাভ করত। কিন্তু আধুনিক যুগে এই লোকশিক্ষার হ্রাস পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'লোকশিক্ষার ' প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছেন-

"সুশিক্ষিত যাহা বোঝেন অশিক্ষিতকে ডাকিয়ে কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্বত্রে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত, অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশলে তাহা ঘটিবে না।"[৭]

এখন বাঁকুড়ার লোকজীবনে শিক্ষা সম্বন্ধে বলা যাক- এই জেলার লোকজীবনে শিক্ষার তেমন উন্নতি হয়নি। দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষেরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। লোকজীবনে সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষ শিক্ষিত হলেও, বেশিরভাগ মানুষরাই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। আর শিক্ষিত মানুষরা এদের সমাজের এক কোণে রেখেছে। লোকজীবনে আমরা দেখি এই সকল শিক্ষিত মানুষরা অশিক্ষিত মানুষদের প্ররোচনা করে, তাদের নানা ভাবে ঠকায়। এমন কি ছলে বলে কৌশলে এদের দিয়ে শিক্ষিত মানুষেরা স্বল্পমূল্যে অনেক কাজ

করিয়ে নেয়। অথচ এ সকল মানুষদেরও ক্ষুধা আছে, চাহিদা আছে, আশা-আকাঙ্খা আছে, পরিবার আছে। পরিবারের সকলের ক্ষুন্নবৃত্তি নিবারনের ভারও তার উপর অর্পিত। তথাপি তারা যে প্রতারিত হচ্ছে, ঠকে যাচ্ছে জেনেও প্রতিবাদ করে না। এর জল জ্যান্ত প্রমাণ আজও আমরা পাই গ্রামগঞ্জের রাজনীতির ক্ষেত্রে। এসকল অশিক্ষিত মানুষদের জন্য সরকার থেকে যে সুযোগ সুবিধা আসে তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এদের কাছে পৌছায় না। শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষরাই তা ভোগ করে, নিজেদের কোষাগার পূর্ণ করে। আবার শুধু মাত্র এরা নিজেদের কোষাগার পূর্ণ করেই ক্ষান্ত থাকেনি, এরা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এ সকল অশিক্ষিত মানুষদের আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে তথা বাবা, কাকা,জ্যাঠা, ভাই, বোন এদের সকলের মধ্যে একটা ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয়। যা কখনো কখনো চরম আকার ধারন করে। এমনকি তাদেরকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে। আর এরেই সুযোগ নেয় এই সকল শিক্ষিত মানুষেরা। তাই পরোক্ষভাবে শিক্ষিত মানুষেরা তাদের (অল্পশিক্ষিত,অশিক্ষিত মানুষদের) শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখেছে। কিন্তু তারা জানে না এই সকল অশিক্ষিত মানুষেরা তাদের (শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত মানুষদের) খাদ্যের যোগান দিয়ে থাকে। তাই এদের শিক্ষিত করাটা আবশ্যক। কারন এদের শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তারা আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে চাষাবাদ করে ফসলের ফলন বৃদ্ধি করতে পারবে। তবে ১৯৯৯ সালের থেকে বাঁকুড়া জেলার লোকজীবনে সাক্ষরতার অভিযান শুরু হয়েছে। যা গ্রামের মানুষ ভালোভাবেই উপকৃত হচ্ছেন। এমনকি লোকজীবনে তথা গ্রামে যে সকল বিদ্যালয়গুলি আছে সেখানে স্কুলছুট শিশুদের বিদ্যালয় ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের পুষ্টি সাধনের জন্য মিড ডে মিল চালু হয়েছে।এছাড়াও এমন কিছু কিছু 'স্কিম' চালু হয়েছে যেখানে শিশুদের খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও দেওয়া হচ্ছে। যেমন- অঙ্গণওয়াড়ী, শিশুশিক্ষাকেন্দ্র, এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা শিক্ষা প্রসারের কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। সব মিলিয়ে বাঁকুড়ার লোকজীবনে শিক্ষা ক্ষেত্রে নানান প্রকল্প অগ্রনী ভূমিকা পালন করছেন যা একদিন বাঁকুড়ার লোকজীবনের অশিক্ষিত মানুষদের আশার আলো দেখাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাছাড়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা না বলেপারছি না ব্রিটিশ আমলে বাঁকুড়া জেলার লোকজীবনে নানা অঞ্চলের গ্রামগঞ্জে কিছু টোল বা চতুষ্পাঠী ছিল। যেগুলি গ্রামের মানুষদের শিক্ষা ব্যাপারে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিল। বর্তমানে এই টোল বা চতুষ্পাঠীগুলি না থাকলেও তখনকার গ্রামের মানুষদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। তবে বর্তমানে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় লোকজীবনে গ্রামগঞ্জের শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য প্রতিটি অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় বা upperপ্রাইমারি বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে বা হচ্ছে। এইভাবে বাঁকুড়ার লোকজীবনে শিক্ষা প্রসার ঘটছে।

তথ্যসূত্র:

১)'শিক্ষা' প্রবন্ধ গ্রন্থের -'শিক্ষার হেরফের'-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাঠসঞ্চয়ন,পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা 'সংসদ,পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪০

২) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়,তৃতীয় সংস্করণ ১৪১৭, মে ২০১০ ,পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১২৩

৩) 'বিচিন্তা' গ্রন্থের 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি'-রাজশেখর বসু। পাঠসংকেলন,পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ, তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারী ২০০৭,পৃষ্ঠা সংখ্যা -১১৯

৪) 'শিক্ষা' প্রবন্ধ গ্রন্থের - 'শিক্ষার হেরফের'- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাঠসঞ্চয়ন,পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ,পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৯-৪০

৫) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়,তৃতীয় সংস্করণ - ১৪১৭ মে ২০১০,পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১০১

৬) 'কুহু ও কেকা' কাব্যগ্রন্থের ছেলের দল কবিতা- সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পাঠসংকেলন,পশ্চিম মধ্য শিক্ষা পর্ষদ, পৃষ্ঠা সংখ্যা -২৪

৭) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের - তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়, তৃতীয় সংস্করণ ১৪১৭ মে ২০১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৬।

প্রবন্ধ

শুশুনিয়া- পখন্না ঃ ইতিহাসের গতিধারা

রুনু ঘোষ

(সহকারী অধ্যাপিকা ও বিভাগীয় প্রধান,ইতিহাস বিভাগ)

প্রাচীন কাল থেকেই বাংলায় ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ধারা প্রবাহমান ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে আর্য সভ্যতা বা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারা এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। কিন্তু এই অঞ্চলে প্রবাহমান সংস্কৃতিকে আর্য সংস্কৃতি একেবারে গ্রাস করেছিল সেকথা বলা যাবে না। আর্য সংস্কৃতি ও দেশীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা এখানে পরিলক্ষিত হয়। বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত অরণ্যসঙ্কুল বাঁকুড়া জেলা তার ব্যতিক্রম নয়। বাঁকুড়ার জঙ্গলাকীর্ণ রুক্ষ শুষ্ক অঞ্চলকে সজীবতা প্রদান করেছে এবং জনবসতির বিস্তারে সহায়ক হয়েছে দামোদর, কংসাবতী, দ্বারকেশ্বর, ময়ূরাক্ষী, অজয়, ব্রাহ্মণী এই সমস্ত নদ-নদীর জলধারা। আর এই অরণ্য পরিবৃত পাথুরে অঞ্চলের প্রকৃতির মধ্যেই বাংলা তথা এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে চলেছে শুশুনিয়া পাহাড়।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে যে সময়ে সারা ভারত জুড়ে গুপ্ত শাসনের বিজয় রথ ধাবিত হচ্ছে সেই সময়ে বাংলার এই প্রান্তিক অঞ্চল ও রাজনৈতিক ইতিহাসের বাইরে ছিল না। শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহা গাত্রে উৎকীর্ণ শুশুনিয়া লেখ সমসাময়িক সময়ে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক গুরুত্বকে এখনো স্মরণ করায়। লিপিটির সময়কাল ভাষাতত্ত্বের বিচারে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক স্থিরীকৃত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ডিহর-শুশুনিয়া- পখন্না এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মানব সভ্যতার প্রসার ঘটেছিল যার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে শুশুনিয়া ডিহর পুষ্করণা পরিবেষ্টিত বিভিন্ন অঞ্চলে শুশুনিয়া পাহাড় এবং পাহাড় সংলগ্ন অঞ্চল তথা গন্ধেশ্বরী উপত্যকায় প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার যে বিকাশ ঘটেছিল শুশুনিয়া পাহাড় ও সংলগ্ন অঞ্চল থেকে প্রাচীন, মধ্য, ক্ষুদ্র ও নব্য প্রস্তর যুগের আয়ুধ আবিষ্কার তার প্রমাণ। বিভিন্ন অতি প্রাচীন জীব জন্তুর দেহাবশেষ পাওয়া গেছে এই অঞ্চল থেকে। সমস্ত দিক থেকেই শুশুনিয়া পাহাড় ও সংলগ্ন অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রত্নক্ষেত্র যেখানে অন্য মাত্রা যোগ করেছে শুশুনিয়া লেখ টি।

শুশুনিয়া লেখটি দুটি পৃথক ভাগে বিভক্ত। কেন্দ্রস্থলে প্রজ্বলিত শিখাসহ একটি প্রদীপ এবং তার চতুর্পার্শ্বে চৌদ্দটি অগ্নিশিখা সমন্বিত একটি চক্রের বাম দিকে এবং নিচে শুশুনিয়া লিপিটি উৎকীর্ণ। লিপিতে ব্যবহৃত ভাষা এবং লিপির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে যথেষ্ট মতবিরোধ বিদ্যমান। সংস্কৃত ভাষায় এবং গুপ্ত লিপির পূর্বাঞ্চলীয় হরফে লিপিটি উৎকীর্ণ বলে মনে করা হয়। অনেকে আবার মনে করেন এই লিপিতে শঙ্খ লিপির ব্যবহার হয়েছে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় শুশুনিয়া লিপি কে বাংলাদেশের প্রাচীনতম লিপির নিদর্শন বলে মতামত দিয়েছেন। সুখময় চট্টোপাধ্যায় এর মত ব্রাহ্মী লিপির নিচে শঙ্খের আকৃতি বিশিষ্ট খন্ডিত অংশ আছে যা শঙ্খলিপির নিদর্শন বলে মনে করা হয়। শুশুনিয়া লিপির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অনেক ভাষা তাত্ত্বিক এর অভিমত এই যে পুষ্করণাধিপতি মহারাজ শ্রী সিংহ বর্মার পুত্র চক্র স্বামীর দাসশ্রেষ্ঠ শ্রী চন্দ্র বর্মা কোন কীর্তি উৎসর্গ করলেন। আরেকটি মত অনুসারে শুশুনিয়া পর্বতে দুটি লিপি বর্তমান এবং তার অর্থ উপরের অর্থের অনুরূপ নয়। এই মত অনুযায়ী লিপিটির একটি অংশের বিষয়বস্তু দাঁড়ায় পুষ্করণার অধিপতি মহারাজ শ্রী সিংহ বর্মার পুত্র মহারাজ শ্রী চন্দ্র বর্মার বিশেষ কোন কীর্তি এবং অন্য অংশটির অর্থ দাঁড়ায় চক্র স্বামীকে ধোসো নামক গ্রাম উৎসর্গ করা হলো। কে এই চক্রস্বামী সে সম্পর্কেও মতপার্থক্য বিদ্যমান। বেশিরভাগ ঐতিহাসিক চক্রস্বামী অর্থে বিষ্ণুকে অভিহিত করলেও অনেকে মনে করেন এটির সাথে বৌদ্ধ বা জৈন যোগ থাকা অসম্ভব নয়।

রাজা চন্দ্রবর্মণের শিলালিপি, শুশুনিয়া, বাঁকুড়া।

লিপিটি থেকে পুষ্করনার অধিপতি মহারাজ শ্রী সিংহ বর্মার পুত্র চন্দ্র বর্মার কথা, তিনি যে চক্র স্বামী অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন সে বিষয়ে জানতে পারা যায়। তবে কে এই রাজা চন্দ্র বর্মা, তার পরিচিতি কী সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে যথেষ্ট মতবিরোধ বর্তমান। মেহেরৌলিতে প্রাপ্ত লৌহস্তম্ভে উল্লেখিত রাজা চন্দ্র এবং চন্দ্র বর্মা এক বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করে থাকেন। আবার অনেকের মতে সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভ লিপির চন্দ্র বর্মন হলেন শুশুনিয়া লিপিতে উল্লেখিত মহারাজ শ্রী চন্দ্র বর্মা। আবার অনেকে তাকে গোয়ালিয়রের মান্দাসর লিপিতে উল্লেখিত পশ্চিম রাজপুতানার শাসক বলে অভিহিত করে থাকেন। যদি ও বেশিরভাগ ঐতিহাসিক তাকে একজন স্থানীয় শাসক হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন যার রাজ্য ছিল পুষ্করনা। বর্ধমান জেলার অজয় নদীর তীরে অবস্থিত উজানি- মঙ্গলকোটের প্রাচীন ঢিবি খুঁড়ে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির সীলে 'নাগদত্ত' শব্দটি উৎকীর্ণ দেখা যায় খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্তী ব্রাহ্মী হরফে।

সমুদ্রগুপ্ত এলাহাবাদ প্রশস্তিতে আর্যাবর্তের নয় জন রাজার নামের তালিকায় চন্দ্র বর্মন এবং নাগ দত্ত এই নাম দুটি উল্লেখিত দেখা যায়। এ থেকে চন্দ্র বর্মন এবং নাগদত্ত দুজনে যে সমকালীন শাসক এরকমটা মনে করা হয়। সংস্কৃত অনুরাগী ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক রাজা চন্দ্র বর্মন শুশুনিয়া -পুষ্করনা অঞ্চলে আর্যীকরণ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিকাশ ঘটাতে সহায়ক ছিলেন বলে অনেকের ধারণা।

পুষ্করণা নগরের অবস্থান সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত যোধপুরের নিকটবর্তী পোখরান নগর হলো লিপিতে উল্লেখিত পুষ্করনা। যদিও বহু ঐতিহাসিক পুষ্করনা ও বর্তমান শুশুনিয়ার ২৫ মাইল দূরবর্তী গ্রাম পাখন্না এক ও অভিন্ন বলে মত প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া থানার অন্তর্গত গ্রাম পখন্না। দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে এই গ্রামের অবস্থান। এই অঞ্চল থেকে প্রভূত পরিমানে প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু আবিষ্কার হয়েছে। দামোদর নদের জলস্ফীতি ঘটে প্রতি বর্ষায় তাই এই অঞ্চলের বহু প্রত্নবস্তু নদীর গর্ভে হারিয়ে গেছে। তবুও অনুসন্ধান কার্যের ফলে আদি-ঐতিহাসিক থেকে পাল-সেন যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রত্নবস্তুর প্রাপ্তি এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক পরিচয় কে সুস্পষ্ট করে। বিভিন্ন ধরনের মাটির পাত্র, কলস, বর্ষা ফলক, লোহার বাটালি, পাথরের পুঁতি ইত্যাদি বহু প্রত্নবস্তু এই অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুশুনিয়া-পুষ্করণা এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মানব সভ্যতার প্রসার ঘটেছিল তার প্রমাণ শুশুনিয়া ও পোখন্না থেকে বহু প্রাচীন জিনিস প্রাপ্তি থেকেই বোঝা যায়। তাই এই অঞ্চল যে মানব সভ্যতার যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে অরণ্য পরিবৃত শুশুনিয়া পাহাড় ও তৎ সংলগ্ন অঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থা খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে কেমন ছিল তার সুস্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায় না। শুশুনিয়া লিপিতে উল্লেখিত পুষ্করনা এবং বর্তমান পখন্না যদি এক স্থান হয় তাহলে তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যে আশেপাশের মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনে প্রভূত পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল তা বলা যায়। প্রচলিত কিছু ছড়ার মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়-

'চার মাস বর্ষা পোখরণা যায়
পোখরণা গিয়ে দেখি দুয়ারে মরাই
ছোট মরাইয়ে পা দিয়ে

বড় মরাইয়ে পা দিয়ে
রাই এলো গো ঝলমলিয়ে।'

উপরিউক্ত ছড়া থেকে পুষ্করনার কৃষি সমৃদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট। বর্ষাকাল বহু মানুষের জীবনে অভাব নিয়ে আসে এবং জীবন জীবিকা চালানো মানুষের পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সেই সময়ে খাদ্যাভাব দূর করতে, কাজের সন্ধানে অনেকে পখন্না যেতেন এবং তাদের অন্নের অভাব দূরীভূত হতো সেখানে গিয়ে। সেখানে যে খাদ্যে মজুত থাকতো তা আশেপাশের অঞ্চলে অজানা ছিল না।

বাঁকুড়া আজও একটি প্রান্তিক জেলা হিসেবে পরিচিত এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছনের দিকে তার অবস্থান। ঔপনিবেশিক আমলে এই অঞ্চল দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছে বারবার। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কৃষি সমৃদ্ধ পখন্নার উপস্থিতি এক সমৃদ্ধ অতীতের দিকে ইঙ্গিত করে যদিও সমস্ত অঞ্চল সেই সমৃদ্ধির আওতায় ছিল না। পাশাপাশি শুশুনিয়া লিপি তে ভূমি দানের যে তথ্য পাওয়া যায় তা সেইসময়ের ধর্মাচরণের গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

প্রাচীন ভারতে বিশেষত গুপ্ত যুগে ভূমিদান অত্যন্ত পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হতো। গুপ্তযুগে প্রচুর পরিমাণে ভূমি দান এর প্রমাণ বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত ভূমিদান সংক্রান্ত শিলালেখ, তাম্রলেখ তে পাওয়া যায়। বাঁকুড়া অঞ্চলে একসময় বৈষ্ণব ধারার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল। মল্ল রাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুর একদা বৈষ্ণব সংস্কৃতির মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বিষ্ণুভক্তির সুপ্রাচীন উপস্থিতি যদি খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে এ অঞ্চলে বিস্তারিত হয়ে থাকে এবং পুষ্করনার অধিপতি মহারাজ শ্রী চন্দ্র বর্মা যদি চক্রস্বামী বিষ্ণুর উপাসনার জন্য একটি গ্রামের রাজস্ব উৎসর্গ করে থাকেন সেটা খুব একটা অস্বাভাবিক বিষয় নয়। দীর্ঘদিন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অগ্রগতির পর গুপ্ত যুগে নতুন করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনুরুজ্জীবন ঘটতে শুরু করেছিল। বাঁকুড়া অঞ্চলেও তার প্রভাব পড়ে থাকতে পারে।

প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র শুশুনিয়া পাহাড় এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সুপ্রাচীন ইতিহাস আগলে দাঁড়িয়ে আছে। পর্যটন স্থল হিসেবে প্রচুর মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে এখানে প্রতিনিয়ত আসা-যাওয়া করেন। বিশেষত বনভোজন করতে প্রচুর মানুষ আসেন শীতকালে। শুশুনিয়া পাহাড় থেকে অনবরত ঝরে পড়া ধারার জলে স্নান করে পূণ্য সঞ্চয় করে বা শুশুনিয়ার বিখ্যাত পাথরের জিনিসপত্র ক্রয় করে তারা ফিরে যান। অনেকেই শুশুনিয়া লিপি সচক্ষে দেখতে যান শুশুনিয়া পাহাড়ের যম ধারা সংলগ্ন অঞ্চলে। শুশুনিয়া পাহাড় ও সংলগ্ন অঞ্চলে আরো ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান কাজ চালানো হলে এই অঞ্চলের হারানো ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে এবং এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক- রাজনৈতিক ইতিহাসের গতি প্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট সহায়ক হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সেই সঙ্গে শুশুনিয়া লিপির বিষয়বস্তু সংক্রান্ত যে মতবিরোধ আছে তা দূরীভূত হবে এবং পুষ্করণার সাথে শুশুনিয়ার যোগাযোগের আরো গুরুত্বপূর্ণ দিক উদঘাটিত হবে বলে আশা করা যায়।

তথ্যসূত্র ঃ

দীনেশচন্দ্র সেন - বৃহৎ বঙ্গ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৩৫

শ্রী রথীন্দ্র মোহন চৌধুরী - বাঁকুড়া জনের ইতিহাস, বেস্ট বুকস, কলকাতা, ২০০০

মনোরঞ্জন চন্দ্র- মল্লভূম বিষ্ণুপুর, কলকাতা পুস্তক মেলা, ২০০৪

অমিয় পাত্র (মুখ্য উপদেষ্টা)- বাঁকুড়া পরিচয়, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২

প্রবন্ধ

বাঁচতে হলে খেলতে হবে

সুশান্ত সিংহ (কলেজ স্টাফ)

দুর্বল শরীর আর হতোদ্যম মন মানুষের উন্নতির পথে নিঃসন্দেহে প্রধান অন্তরায়। শরীর ও মনের সুস্থতার উপর নির্ভর করে চারিত্রিক গুণাবলি ও ব্যক্তিত্ব। এই অর্থে *Personality expression of man* কথাটি তাৎপর্যপূর্ন। প্রবাদের মতো প্রমাণিত হয়েছে "*Health is wealth*"।

স্বাস্থ্য বিকশিত নাহলে কোন কর্মই সুন্দর ও সাফল্যমন্ডিত হয়ে ওঠেনা। নিয়মিত শরীরচর্চার মাধ্যমে মানুষ সবল ও সুঠাম দেহ লাভ করে। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে "*All work and no play made Jack a dull boy*"- প্রাচীন তপোবনীয় শিক্ষাদর্শে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট পাঠ গ্রহনের ফাঁকে এমন কতকগুলি কর্মে নিযুক্ত হত, যার মধ্যে দৈহিক পরিশ্রম হয় যেমন - ১) পুষ্পচয়ন করা ২) কাঠ সংগ্রহ করা, ৩) গো- পালন করা ৪) জমি চাষ করা।

আধুনিক চিকিৎসক ও মনস্তাত্ত্বিকরা চরিত্র গঠনে খেলাধুলার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ফ্রয়েবেল এবং রবীন্দ্রনাথ এই দুই শিক্ষাবিদ শিশু শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ রূপে খেলাধুলাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রেখেছেন।

খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শুধু পড়াশুনায় ভালো হয় না, সেই সঙ্গে মানসিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ হয় , খেলাধুলা মানুষকে শৃঙ্খলিত হতে শিখায়। ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনাটি স্মরনীয়- "*The battle of Waterloo won or the play -field of Eton*"

খেলাধূলা আমাদের স্বদেশ প্রেম প্রভাবিত করে। তাই আন্তর্জাতিক ক্রীড়াগুলিতে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা যতই থাক প্রত্যেকেই চান তার দেশ বিশ্বের মানচিত্রে নিজের জায়গাটা করে নিক।

সহপাঠ্য ক্রমিক কার্য্যবলির মধ্যে খেলাধূলা গুরুত্বপূর্ণ, এছাড়া-

১) খেলা, স্বাস্থ্য, সুস্বাস্থ্য পত্রিকাগুলির মধ্যে খেলাধুলা ও শরীরচর্চা আলোচিত হয়।

২) দৈনিক সংবাদপত্রের অতি জনপ্রিয় বিষয় খেলার আসর।

৩) ক্রিকেট, ফুটবলের মতো আন্তজার্তিক খেলাগুলি গণচেতনাকে সদাজাগ্রত রাখে।

যে শিক্ষা শুধুমাত্র পন্ডিত হতে প্ররোচনা করে সেই শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের অমল কে মেনে নেয় নি তা তার পিসেমশাইকে স্পস্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছিল। প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং পাশ্চাত্যে ফ্রয়েবল চেয়েছিলেন শিক্ষার্থী পড়াশুনা শিখবে খেলতে খেলতে আপন মনে।

অর্থাৎ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষায় শিক্ষার্থীর মানসিক গঠন অপূর্ণ থাকে। শিক্ষার্থীকে শেখায় বিনয়ী হতে। নীতিনিষ্ঠ হতে এবং সর্বোপরি শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন করতে।

শিক্ষার্থীরা খেলাধূলা করুক, সেটা ভালো। কিন্তু পড়াশুনাটা সঙ্গে দরকার। দেহের বিকাশে খেলা, মনের বিকাশে পড়া, আবার সুনাম ধন্য খেলোয়াড় হওয়ার পর যেন বাণিজ্যিক মন না হয় তাহলে ব্যক্তি খেলোয়াড় লাভবান হবে ঠিকই কিন্তু দেশের পক্ষে তা সামগ্রিক কল্যান হবেনা। সুতরাং খেলোয়াড়কে বৃহৎ স্বার্থকে গুরুত্ব দিতেই হবে। কারণ খেলোয়াড় শুধু নিজের জন্য নয় দেশের সম্পদ।

পরিশেষে বলি জীবনের প্রতিষ্ঠার মধ্যে শিক্ষালাভ শেষ কথা নয়। শারীরিক সুস্থতা সেখানে অন্যতম ভূমিকা নেয়। খেলোয়াড় ও দর্শকের মানসিকতা প্রমান করে একটি দেশের শৃঙ্খলা ও শিষ্টাচার। সুতরাং মানসিক বৃত্তির পরিপূর্ণতা অর্জনে এমনকি মানবিক মূল্যবোধের সম্পূর্ণতা রক্ষায় খেলাধূলার ভূমিকা অপরিহার্য্য। আর এজন্য বিদ্যালয়ে শরীর শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি।

Essay

Effects of COVID-19 on India's Education System

Dr. Sathi Mukherjee

Assistant Professor, Department of Mathematics

The Coronavirus (COVID-19) was declared a pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020. It is established that this virus influences the aged persons with comorbidity, the most. However, it has globally impacted many sectors like smalland large-scale businesses, the world economy, the health sector, transportation, wages, industries, education, etc. This pandemic has majorly brought adverse effects on every field of life throughout the world. However, it is evident that during the global lockdown, a lot of curricular activities, including regular courses, webinars, faculty development programs, lectures, training, and certification programs, have flourished when it comes to the education sector. While this online facility has made education easier and morecomfortable, it has its limitations also. As per the UNESCO report, the worldwide lockdown has affected over 91% of the world's student population, estimation predicts that the coronavirus will adversely impact over 290 million students across 22 countries. The same report estimates that about 32 crore students are affected in India, including those in schools and colleges.

During this pandemic, the education sector has experienced gross changes such as a shift from regular contact classes to online platforms, modified teaching pedagogy adopted by teachers, conduction of examinations and competitive exams through online mode, etc.

There are several challenges due to COVID-19 on education. First, to protect the traditional teaching system, which has entirely shifted to online teaching, which requires teachers' training, strong technical support, and high-speed internet, not accessible to everyone. Secondly, the assessment and evaluation system using an online platform does not provide student performance accuracy, because the authenticity of the performance cannot be assured. The students may use some unfair means like using some other device to get help while answering the questions asked during the assessment. Thirdly, the research platform has been affected grossly, including international travel, cancellation, and postponement of conferences and seminars. However, many such events have shifted to online platforms, which has increased the participation and popularity of these events. The fourth concern is student mental health and career, which are grossly affected due to this outbreak.

COVID-19 has brought the entire education system from traditional to online modes. There are various online platforms available for learners and professionals. The students can work with peace of mind while staying at their homes where their time, energy, and money are not wasted traveling. They are not fatigued and hence can engage themselves more in comparison to pre-COVID conditions in academic activities. Studying at home has also provided a more

significant benefit to the students being directly monitored by parents. When it comes to theory classes, the online platform has given them a vast chance to excel. However, the practical assignments that the students are supposed to do in laboratories and fields have been constrained. This has created a significant limitation for teachers when they cannot provide demonstrations to the students in the absence of laboratory instruments and other necessary practical materials.

However, this has led to the timely completion of courses despite the complete lockdown but with partial knowledge among students whose courses are more practical-based. Therefore, a combination of these pros and cons has brought the education world to a different level.

Several online platforms are available for lectures, training, etc., which have made learning easier. However, in the absence of contact teaching, a one-to-one discussion between a teacher and students is adversely influenced.

In the absence of a formal class environment, the student's attentiveness is more likely to be adversely influenced.

Where the online facility has provided the ease of learning through flexi classes, there is no surety that the student himself or herself is attending the class. Due to network troubles, sometimes the teacher and students face many disturbances in the teachinglearning process. Students sometimes get involved in mischievous activities by making fake email IDs, making noises, giving inappropriate comments, etc. The teacher faces difficulty in maintaining discipline. However, this online mode is more appropriate for some disciplines than direct contact teachings, such as web designing, etc., where the practical demonstration can be better understood through online presentation and screen sharing options.

On the other hand, students from low socio-economic communities sometimes do not get the opportunity to experience online learning due to a lack of smartphones, internet connections, or technical proficiency. This creates a huge and unfair social stratification where learners are deprived of their genuine right to education. In developing countries like India, where a huge population belongs to rural backgrounds, people are not so technology-friendly. This is another challenge for the Indian education system despite the availability of technological facilities. While talking about the family environment, it has been observed that many faculties are reporting online teaching difficulties. Especially in children's cases, it is reported that the families are not cooperating to maintain the class's decorum. The family members keep disturbing the child for one or the other reason, which causes the child to continue with disturbing and inattentive behavior. The cognitive skills of the parents also have a significant role in understanding and growth of the child. If the academic and the other assignments are better understood by the parents, the children will have a constant source of support whenever needed without any delay
or waiting time for the next interaction with the teacher. In this aspect, India is facing much difficulty because a large population is illiterate or less educated to complement the contemporary educational demands of their children. Hence, the family has a central role in the learning of the child.

Teachers who are more apt and comfortable in contact teaching cannot give their 100%

through online lectures. A very advantageous and constructive aspect that emerged during the lockdown is that many professionals started throwing free online courses, training programs, workshops, webinars, etc., which have given a good chance to all learners to update their credentials at no expense. People having busy official schedules who are usually not able to spend time in such programs get a chance to upgrade themselves.

Regarding the physiological and cognitive effects, online education has both advantages and disadvantages. It was found that digital media plays a significant role in making the neural connection for a growing human brain. However, the screen usage of more than the recommended hours can lead to lower brain development. This also leads to the disruption of sleep.

Another major concern is the availability of study resources. Not all the study material is available through online mode. Several offline materials are usually available in the library but not in the online database. A student is being deprived of these materials. Furthermore, educational institutions, which have decided to conduct online examinations, face difficulty in preparing question papers. The question papers are mostly multiple-choice types that do not give the student a window to write descriptive answers, which are equally important for a student to learn.

In direct contact teaching, the teaching and stationary materials are required, in the absence of which teaching is likely to suffer. The online teaching platform has covered this drawback of direct contact teaching. However, online teaching makes people more digitally dependent by reducing direct and one-to-one social interaction. This is gradually making people more machine-dependent and less human.

At the tertiary level, almost all universities and colleges have offered online courses and switched to virtual lectures, classes, and webinars since digital learning has emerged as a significant aid for education. Although the contingencies of digital technologies rendition go past a stop-gap solution during the crisis, it has helped answer a new set of questions entirely about what, how, where, and when students shall learn. With the help of technology, students and teachers can ingress resource materials and not limit just to the textbooks in different formats, and styles at their own pace and time by just going online. Besides teachers, smart digital technologies do not just teach. Instead, it simultaneously observes and monitors how we study, how we learn, what interests us, the tasks that we are involved in, and the kind of problems that we face and find difficult to solve and adapt accordingly to meet the needs of the learner with more accuracy, specifications as compared to traditional learning within classrooms.

Various issues arise due to prolonged school closures and home confinement impacting students' well-being during COVID time wherein students feel physically less active, sleep irregularities, dietary changes marked by weight gain along with low motivation, boredom resulting in getting more anxious, and irritable as well. Abundant research has been carried out, suggesting adverse effects on physical and psychological health in school-going children and students pursuing higher education at colleges and universities. Nevertheless, at the tertiary level, the closing of campuses left them with no choice but to leave hostels and dormitories and return to

their hometown; however, many got stuck too, leaving them helpless and anxious.

The switch to online education ensures minimum loss of studies suffered, and progress and attainment are also closely monitored via timely assessment and evaluations.

Imparting of average grade points based on course completion for students pursuing higher studies, deferring the exams till further notice, and promotion to the next level using "predictive grade," were announced by a few higher education institutions and schools. The evaluation method and assessment will also change from traditional high stakes to small project-based and activity, assignment-based evaluation shortly as the pandemic continues.

To better understand the teaching and learning process during this crisis, it is imperious to have an education reform made to provide necessary teacher training, making further advancement of the new normal digital learning for functioning smoothly in the future as well in similar situations.

However, as a need of the hour, education shall increasingly embrace online/virtual classrooms, keeping in mind the exposure to students' screen time in a day, and planning of activities wherein parental involvement, assistance, and guidance are. More physical education, music, dance, and home gardening should be focussed on to enhance creativity and affective domains that advertently shall enhance motivation, physical activities, and in adolescence, continuous sitting, eye strains, and issues like cyberbullying, video game addictions and social media browsing can be put under control. Even university students, through distance learning, can collaborate with others, watch pre-recorded lectures, and have fruitful discussions. The lecturer can be more of a facilitator rather than an instructor. Distance learning can be as effective as a traditional face-to-face mode of learning. Students have more family time; they can engage at their own pace.

However, this pandemic situation has introduced the need for updating and equipping educators with modern technology with high-speed internet, continuous power supply, and cyber security, as well as proper training for educators and students to have skills and competencies to operate electronic devices, along with the necessary knowledge and understanding about the method in which the information is imparted to the learners. A common goal is to overcome the learning crisis faced and deal effectively with the adverse situation.

The COVID-19 pandemic has stirred up the world, and its overwhelming impacts can be seen from micro to macro level, that is, from an individual's day-to-day functioning to the broader level-health sector, finance sector, and of course, the education sector. The younger generation is considered to be the torchbearer of the society. As such, their nutrition, health, safety, and education for holistic development being basic essential needs should be a prime concern for policymakers and all nations worldwide. The effects of the pandemic situation on the education sector are both negative as well as positive.

The education sector experienced a shift from contact teaching to digital learning and got a boost through various online platforms despite having its limitations such as home confinement, blocked socialization etc; at the same time includes the multidimensional positive impact of self-learning and self-dependency and to cope with the world in the education sector in a common platform.

প্রবন্ধ

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে দেশাত্মবোধ

দেবাঙ্গনা কর্মকার (অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁর রচনায় রোমান্স ও বাস্তবতার অপূর্ব সমন্বয়ে উপন্যাসের সমস্তরকম সম্ভাবনার দ্বার উদঘাটন হয়েছিল। ভাষা ও নির্মাণকুশলতায়, ইতিহাস-রোমান্স, সমাজবাস্তবতার সন্নিবেশে ব্যক্তিমানষের দ্বন্দ্ব-জটিলতার গভীর বিশ্লেষণে, সমাজজীবনের বহুমাত্রিক টানাপোড়নের উন্মোচনে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থকতম শিল্পী যাকে অতিক্রম করা আজও সম্ভব হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবনকালের (২৬শে জুন,১৮৩৮ - ৮ই এপ্রিল, ১৯৯৪) শেষ তেইশ বছরের (১৮৬৪-১৮৮৭) মধ্যে মোট ১৫খানি উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস ইংরেজিতে লেখা- *"Rajmohan's Wife"*, এটি ১৮৬৪ সালে *'Indian Field'*নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি বাঙালির দ্বারা রচিত প্রথম ইংরেজি উপন্যাস। বাংলা ভাষায় লেখা তাঁর প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" (১৮৬৫) এবং সর্বশেষ উপন্যাস "সীতারাম" প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে। এরপর তিনি আরো সাত বছর জীবিত ছিলেন, কিন্তু প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্র তখন উপন্যাস নিয়ে আর ব্যস্ত হননি কারণ প্রবীণতার ধূসর অপরাহ্নে পৌঁছে তিনি বুঝেছিলেন তাঁর উপন্যাস লিখবার ভান্ডার নিঃশেষ হয়ে গেছে। বঙ্কিমের বাংলা উপন্যাসগুলির মধ্যে দুটি দেশাত্মবোধক- ১. আনন্দমঠ (১৮৮২) ২. দেবী চৌধুরানী (১৮৮৪)।

বঙ্কিম যে সময় কালের প্রতিনিধি সে সময়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা কতটা দানা বেঁধেছিল বলা শক্ত। রাষ্ট্র সম্পর্কিত কোন আধুনিক ধারণাই সেরকমভাবে এদেশে তৈরি হয়নি। রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চিন্তাও ছিল অকল্পনীয়। ধর্মীয় বা সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়কদের যতটা উৎসাহ ছিল, রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ততটা উৎসাহ ছিল না। রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে। শাসক শ্রেণীর আসল চেহারাটা বোধহয় তাদের চোখে সকলের আগে ধরা পড়েছল। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে সাঁওতাল বিদ্রোহ বা বিভিন্ন পর্যায়ের কৃষক বিদ্রোহকে ধিক্কারই জানিয়েছিলেন। নীল বিদ্রোহকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সমর্থনের মধ্যেও শ্রেণীস্বার্থ নিহিত ছিল। নীলকর সাহেবেরা কেবল রায়তদের সর্বনাশই করেনি বাঙালি জমিদারদের স্বার্থেও তারা ঘা মেরেছিল।

আসলে যুগটাই ছিল মোটামুটিভাবে Collaboration- এর যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর 'কলোনিয়াল'ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর অস্তিত্বই নির্ভরশীল ছিল বিদেশী শাসনের স্থায়িত্বের উপর। তাই ইংরেজকে তাড়ানোর উপায় সন্ধান করতে তারা তেমন আগ্রহী ছিলেন না বরং ইংরেজরা ক্ষমতাচ্যুত হতে পারে এমন অবস্থা দেখা দিলেই তারা বিচলিত বোধ করতেন। এ ব্যাপারে রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত কোন চিন্তানায়কই ভিন্নমত পোষণ করেননি। ইংরেজ শাসনের স্থায়িত্ব মেনে নিয়েই তারা নিরাপদে সদলবলে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারে নেমেছিলেন। মনে হয় গোটা উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মীয় বা সমাজ সংস্কারের প্রবল উৎসাহের এটি অন্যতম কারণ। কারণ অন্তত এই ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণীর কাছ থেকে প্রত্যাঘাতের কোনো আশঙ্কা ছিল না। মাটি ও মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিহীন এই শ্রেণীর মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাও তাই ছিল শ্রেণীস্বার্থভিত্তিক, বঙ্কিমও এর ব্যাতিক্রম নন।

অবশ্য বঙ্কিমের কাছ থেকে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ আশা করাও অযৌক্তিক। তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনীতিতেই অংশ নেন নি, রাজনীতি সম্পর্কে তার বরং একটা ভীতিমিশ্রিত বিরূপতাই ছিল। সম্ভবত চাকুরীজীবী মধ্যবিত্তের নিরাপত্তাবোধ থেকেই । তার বোধহয় এমন কথাও মনে হয়েছিল যে পরাধীন দুর্বল জাতির রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি করা কেবল বিপদজনকই নয়, তা হাস্যকরও বটে। অথচ বঙ্কিমের জীবনকালেই এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনকে একটা সংগঠিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল, কোন কোনটির সঙ্গে তিনি পরোক্ষ যোগাযোগও রেখেছিলেন। ১৮৭৬ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠাকালে তিনি শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শকে সমর্থন করলেও তাদের কার্যপদ্ধতি তার কাছে সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয়নি। সাহেবি পোশাক পরা ইংরেজি বুলি আওড়ানো ব্যারিস্টারের দল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে কর্তৃত্ব করতেন। তাদের দেখেই বোধহয় বঙ্কিমের এই মন্তব্য, সম্ভবত তাদের দেখেই প্রচলিত পলিটিক্সের প্রতি বঙ্কিমের এতটা বিরূপতা। তবে স্বাদেশিক আন্দোলন, সমাজ বিকাশ, শিক্ষা, ঐতিহ্য - সব কিছুর সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল।

পলাশীর যুদ্ধের প্রায় এক যুগ পরে ইংরেজরা যখন ভারতবর্ষের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তখন বাংলার পুতুল নবাব সিংহাসনে বসে দেশ চালাচ্ছেন। ইংরেজদের অত্যাচারে বাংলার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। রাজস্ব আদায়ের অতিরিক্ত চাপে মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। ফলস্বরূপ ১৭৬৯-'৭০ সালে ভয়াবহ মন্বন্তর হয়। আর এই সময়টাকেই উপজীব্য করে বঙ্কিম রচনা করলেন তাঁর আলোচিত-সমালোচিত উপন্যাস "আনন্দমঠ" (১৮৮২)। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় "আনন্দমঠ" উপন্যাসটি ছাপা হয়। বই আকারে বেরোয় ১২৮৯ বঙ্গাব্দে মানে ১৮৮২ সালে। আনন্দমঠ উপন্যাসটির লক্ষ্য ছিল তৎকালীন হিন্দু সমাজের 'রেঁনেসা' বা নবজাগরণ সৃষ্টি করে ভারতবর্ষে আর্যদের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনা। তবে ইউরোপীয় নবজাগরণের মতো শিল্প বা সাহিত্য দিয়ে নয়, বরং বিতর্কিত একটি উপায় দেখিয়ে দিয়েছিলেন বঙ্কিম, যুদ্ধ বা সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া।

উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে কাল্পনিক গৌরবময় ভূমিকায় স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র "আনন্দমঠে" দেশাত্মবোধের মহাকাব্য রচনা করেন। "আনন্দমঠ" উপন্যাসে ঔপন্যাসিক মানবচরিত্রের দুটি দিককে তুলে ধরেছেন। একটা হল মানব জীবনের তাত্ত্বিক দর্শন, অন্যটি মানব জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম। দেশাত্মবোধকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্র নর-নারীর মূল সমস্যাগুলিকে এখানে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের মূলকথা দেশপ্রেম হলেও এখানে তিনি নর-নারীর যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ তাকে অস্বীকার করতে পারেননি। একদিকে কর্তব্যবোধ অন্যদিকে নারীর প্রতি আকর্ষণ "আনন্দমঠ" উপন্যাসে ভবানন্দ ও জীবানন্দের জীবনে দোলাচলতা সৃষ্টি করেছে।

ব্যক্তিত্বের সংকটের অস্তিত্ব অল্পবিস্তর সব যুগেই। ধনতন্ত্রের আগমন এবং শিল্প বিপ্লবের সূচনার ফলে এই সংকট তীব্রতর হয়েছে মাত্র। ধর্মীয় বিশ্বাসের আবরণেও যে ব্যক্তির নিজস্ব চেহারাটি ফুটে উঠত তার জন্য মধ্যযুগে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্কিমের উপন্যাসেই তার প্রমাণ রয়েছে। "আনন্দমঠ" উপন্যাসের সন্তানদের নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে তাদের মানুষ হিসাবে বিচার করা হয়েছে সবচেয়ে কম। তাই ভবানন্দ এবং জীবানন্দের চিত্ত সংকট শেষ পর্যন্ত দেখেও না দেখার ভান করাতেই সাধারণভাবে নিরাপদ বলে মনে হয়েছে আমাদের। বোধহয় এই কারণে সন্তান ধর্মে দীক্ষিত সর্বত্যাগী ভবানন্দের পরস্ত্রী কল্যাণীর উদ্দেশ্যে এই মর্মান্তিক স্বীকারোক্তিটি তেমন গুরুত্ব পেল না,- "আমি জানতাম না যে, সংসারে এ রূপরাশি আছে।এমন রূপরাশি আমি কখনো চক্ষে দেখিব জানিলে, কখনো সন্তানধর্ম গ্রহণ করিতাম না। এ ধর্ম এ আগুনে পুড়িয়া ছাই হয়। ধর্ম পুড়িয়া গিয়েছে, প্রাণ আছে।" শাস্ত্রীয় ধর্মের কাছে মানবধর্ম কখনো পরাজিত হয় না, এমনকি ধর্মীয়

চরিত্রের ক্ষেত্রেও নয়। জীবানন্দের ট্রাজেডিও কিছু কম নয়। সন্তানধর্ম তাকে স্ত্রীশক্তির সাহচর্য থেকে বঞ্চিত করেছে। স্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ যে ব্রতভঙ্গ ঘটে তার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যুদণ্ড। পরিণতি জানা সত্ত্বেও জীবানন্দ সন্তান স্বত্বাটিকে উপেক্ষা করে মানব সত্তাটিকেই গুরুত্ব দেয় এবং সংসারে ফিরে যাওয়ার আকুলতা প্রকাশ করে ফেলে, "পৃথিবী সন্তানদের আয়ত্ত হইবে কিনা, জানিনা। কিন্তু তুমি আমার আয়ত্ত। তুমি পৃথিবী অপেক্ষা বড়, তুমি আমার স্বর্গ। চল গৃহে যাই আমি আর ফিরিব না।" যদি আদর্শ প্রচারই এই উপন্যাসে বঙ্কিমের প্রধান লক্ষ্য হয় তাহলে তার দুই প্রধান চরিত্র রমণী রূপলাবন্যের মোহে এভাবে অনায়াসে আদর্শভ্রষ্ট হতে চায় কেন ?

বঙ্কিমের উপন্যাসে এভাবে আদর্শনিষ্ঠ সংযমী পুরুষের ব্রতভঙ্গ হয়েছে বারবার। ভবানন্দ, জীবানন্দ দুজনই বঙ্কিমচন্দ্রের মডেল চরিত্র। নিছক ধর্ম, দর্শন বা আদর্শপ্রীতি কোন মানব চরিত্রকে স্বাভাবিক করে না। তাই আদর্শের কথা মনে রেখে বঙ্কিম চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেন, কিন্তু যখনই তারা নিজের পথ ধরে স্বাধীনভাবে চলে তখনই বঙ্কিম লেখকের জবানিতে তাদের তিরস্কার করেন অথবা সতর্ক করে দেন। শান্তির মতো স্ত্রীকে উপেক্ষা করে জীবানন্দ কিভাবে সন্তান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল সেটাই প্রশ্ন ? মনের দিক থেকে সে কোনদিনই সন্তান ধর্মের অনুশাসনকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি আর চিরকুমার ভবানন্দের রূপসী কল্যাণীর প্রতি আকৃষ্ট হবার সুযোগ তো স্বয়ং বঙ্কিমই করে দিয়েছিলেন। চরিত্রগুলি সংকটের মুখে দাঁড় করানোর উপযুক্ত পরিবেশ যিনি রচনা করেন তিনিই আবার যখন তাদের তথাকথিত পদস্খলনের জন্য তিরস্কার করতে থাকেন তখনই বোঝা যায় তিনি নিজেই সংকটমুক্ত নন।

এসব ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য এটাই বঙ্কিমের শেষ কথা- "হায়, রমণী রূপলাবণ্য! ইহ সংসার তোমাকেই ধিক।"- কথাটা তিনি বলেছিলেন ভবানন্দ প্রসঙ্গে। তবে অন্যান্য চরিত্রের ক্ষেত্রেও এটাই তার শেষ কথা। রমণীর রূপলাবণ্য যেখানে আছে সেখানে রূপদর্শন জাত মোহ এবং ভালোবাসা থাকা স্বাভাবিক। আর তার নিজেই তো স্বীকারোক্তি- "রূপ সে তো মোহের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছিল।" বঙ্কিমের উপন্যাসে সমাজকে ছাপিয়ে মানবহৃদয় প্রাধান্য পেয়েছে।

অর্থনৈতিক কাঠামো এবং রাষ্ট্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে জনসমাজ। যে কোন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান কাজই হল এদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটানো। কিন্তু একদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, অপরদিকে বিদেশি শাসকের সুপরিকল্পিত উপায়ে দেশীয় কুটির শিল্পের ব্যাপক ধ্বংস- সমকালের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোটিকেই সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল বঙ্কিমের জানা ছিল না তাও নয়, কিন্তু জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের কথা উনবিংশ শতকে প্রায় শোনাই যায়নি, বঙ্কিমের কণ্ঠে তো নয়ই। তাই সাফাই দিয়েছেন,- "যাহারা জমিদারদের কেবল নিন্দা করেন আমরা তাহাদের বিরোধী। জমিদারদিগের দ্বারা অনেক সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে।" অবশ্যই এর মধ্যে এক ধরনের স্ববিরোধীতাও রয়েছে। প্রজারা নির্মমভাবে শোষিত এবং অত্যাচারিত, অথচ জমিদারীরাও তেমন খারাপ নয়। এ দুটোকে মেলানো যায় কি করে ? রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি যে প্রকৃতপক্ষে সমাজের শ্রেণীগত সংঘাতের প্রতিফলন- তা বঙ্কিমের জানা ছিল- "সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজের রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে- নিষ্কন্টকে ধর্মাচরণ করিবে।" অথবা" বাঙালি দেখে ইংরেজ সভ্যতায়, শিক্ষায়, বলে, ঐশ্বর্যে, সুখে সর্বাংশে বাঙালি হইতে শ্রেষ্ঠ। বাঙালি কেন না ইংরেজের মত হইতে চাহিবে?" বঙ্কিমের যুক্তির মধ্যে তেমন জোর নেই, এ যেন দুর্বলের আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রচেষ্টা। পরাধীনতার মর্মবেদনাকে উপেক্ষা করে স্বদেশী শাসকের পরিবর্তে বিদেশি শাসকের উপস্থিতিকে মেনে নিতেও তারা আপত্তি নেই। 'স্বজাতীয় রাজা, পরজাতীয় রাজা'- উভয় সমান অথচ পরজাতীয় শাসক যে সুশাসন করেনা এ কথা তো বঙ্কিমের ভালোভাবেই জানা ছিল। আসলে বঙ্কিম সুচতুর ছিলেন। তাই ইংরেজদের সাথে লড়তে যাননি কারণ তাতে আর যাই হোক

হিন্দুদের শ্রীবৃদ্ধি হবে না। তাই তো উপন্যাসের শেষে এসে মহাপুরুষের মুখ দিয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন, ইংরেজদের সাথে সংঘাত করো না। বরং তাদের সাথে মিলে নিজের জ্ঞান আর ধন উভয়ই বৃদ্ধি করো। উপন্যাসটির কাহিনীগ্রন্থন সর্বদা সংহত হতে পারেনি, চরিত্রের দিক থেকেও শান্তি ও ভবানন্দ ভিন্ন অন্য কোন চরিত্রই সুপরিস্ফুট হতে পারেনি। সর্বোপরি উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী হাঙ্গামার মতো একটা লুঠতরাজের বিশৃঙ্খল ঘটনাকে জ্যোতির্ময় দেশপ্রেম ও বলিষ্ঠ আত্মত্যাগের আধারে পরিবেশন করাতে কাহিনীটির বিষয়বস্তুগত যথার্থ কিছু ক্ষুন্ন হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে যেমন 'রবীন্দ্রযুগ' বলা হয়ে থাকে, তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশককে 'বঙ্কিমযুগ' বলা হয়। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে তার "আনন্দমঠ" ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়ে সারা ভারতের স্বাদেশিক ও বিপ্লবী আন্দোলনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। "বন্দেমাতরম" সঙ্গীতটিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তার এই "বন্দেমাতরম" মন্ত্র যেন আধুনিককালের ঋকমন্ত্র, যার সুর যে একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে - তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিমের অনুশীলন তত্ত্বের উপর পরিকল্পিত দেশাত্মবোধক উপন্যাসটি হল দেবী চৌধুরানী। উপন্যাসটিতে পুরাতন বাংলার সমাজ ও পারিবারিক পটভূমিকায় স্থাপিত একটি মনোরম গার্হস্থ্য কাহিনী হলেও এর অন্তরালে আছে গীতাতত্ত্বে নিষ্ণাত তাত্ত্বিক বঙ্কিমের একপ্রকার সূক্ষ্ম ধর্মীয় অনুভূতি ও হিন্দুর সামাজিক আচরণ গঠিত তত্ত্বকথা। প্রফুল্ল নাম্নী একটি অতি সাধারন কূলবধূ, যাকে শ্বশুরের একগুঁয়েমির জন্য স্বামীর ঘর ছাড়তে হয়েছিল, নানা ঘটনাচক্রে তাকেই হতে হল ভয়ংকর দস্যুনেত্রী দেবীচৌধুরানী। দেবীচৌধুরানী হয়ে প্রফুল্ল প্রচুর ঐশ্বর্য ও প্রচন্ড প্রতাপের অধিকারিনী হলেও তার গুরুর কাছে গীতার নিষ্কামতত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত হয়ে নারীজীবনের উদ্দেশ্য কি এবং তার স্থানই বা কোথায় বুঝতে পারল। পরে ঘটনা অনুকূল হলে সে সমস্তঐশ্বর্য ও শক্তি ত্যাগ করে আবার স্বামীর ঘরে এসে কুলবধূটি হয়ে পুকুর ঘাটে বাসন মাজতে লাগলো। এতে বঙ্কিম গীতা দত্ত এবং হিন্দু নারীর যথার্থ স্থান সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়েছেন যা উপন্যাসের পক্ষে অনেকটাই অবান্তর।

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে যে কয়েকজন নারী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাদের অন্যতম হলেন দেবী চৌধুরানী। সাময়িকভাবে হলেও প্রফুল্ল নারী হয়েও সামাজিক অত্যাচারের বিপরীতে অঞ্চলভিত্তিক একটা মুক্ত ব্যবস্থা চালু করতে পেরেছিল। শুধু গৃহস্থালির চর্চা নয়, গৃহবদ্ধ পরিসীমায় আত্মাধিকারের স্বার্থপর উৎকণ্ঠা নয়, বৃহত্তর সামাজিক কর্মব্রতে ব্যক্তিত্বের অন্য এক পরিমাপকে ধরতে চাওয়া। কেন্দ্রমুখী নারীর এই কেন্দ্রাতিগ প্রবণতায় বঙ্কিম সামাজিক ঔচিত্যের নতুন চর গড়তে চেয়েছিলেন।"দেবী চৌধুরানী" বঙ্কিমের একমাত্র উপন্যাস যেখানে সমাজনীতির পরিবর্তে সমাজসত্তার আকার বা গঠনকে আমরা দেখতে পাই। তাই আমাদের সমাজ সংসারে প্রফুল্লরা বারবার ফিরে আসে- "এখন এসো, প্রফুল্ল। একবার লোকালয়ে দাঁড়াও-আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলো দেখি," আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্য মাত্র; কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়েছ, তাই আবার আসিলাম।" এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থকতা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. বঙ্কিম রচনাবলী উপন্যাস- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত- অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩. বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর- সমরেশ মজুমদার

প্রবন্ধ

ভারতের উপজাতিদের জীবন গাথা

মৌমিতা গরাই (অধ্যাপিকা)

বিচিত্র দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। বলা হয় ভারত নাকি পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংস্করণ (Miniature of the world)। বিচিত্র এই দেশে বিচিত্র সব মানুষের বাস। আমরা বিভিন্নভাবে তাদের বিভাজিত করার চেষ্টা করি। কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা আদি অনন্তকাল থেকেই ভারতবাসী। আমরা তাদের কখনো বলি উপজাতি, কখনো বলি আদিম জাতি, আবার বলি বন্য জাতি, যাযাবর জাতি প্রভৃতি। এই উপজাতি মানুষদের জীবন যাত্রা প্রণালীও মৌলিক। তাদের আচার-আচরণ, সমাজ-সংস্কৃতি সকলকেই আকর্ষন করে তাদের সমন্ধে আরও আরও অনেক জানতে। ভারতে এরকম অনেক উপজাতির বাস। তাদের জীবনযাপন সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক।

সাঁওতাল ঃ ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল সাঁওতালদের প্রধান বসতি অঞ্চল। রাঁচী, হাজারিবাগ, পালামু ও সাঁওতাল পরগণায় এদের মূল বাসস্থান। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া এবং ওড়িশার কটকের নিকটবর্তী অঞ্চলেও সাঁওতাল বসতি দেখা যায়। অধিকাংশ সাঁওতালরা কৃষিজীবী, পশুপালনও করে। ভাত এবং ভুট্টা এদের প্রধান খাদ্য। মহুয়ার তৈরি মদ ও তামাক এদের প্রিয়। এদের বেশিরভাগ মাটির প্রলেপ দেওয়া বাড়ি। ১০০ থেকে ২০০ টি ঘর নিয়ে গঠিত হয় সাঁওতাল গ্রাম। সাঁওতাল গ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সাঁওতাল হুল বা জাহের যা গ্রামের সীমানা নির্দেশ করে এবং সেখানে বহ আত্মার সমাগম হয়।

সাঁওতালরা সাঁওতালি ভাষায় কথা বলে, কিন্তু এদের লিখিত ভাষা অলচিকি যা ১৯২৫ সালে ড. রঘুনাথ মুর্মু আবিষ্কার করেন। সমগ্র সাঁওতাল সম্প্রদায় ১২টি গোত্রে বিভক্ত- হাঁসদা, মুর্মু, কিসকু, হেমব্রম, সরেন, টুডু, মান্ডি, বাস্কে, বেসরা, পাউরিয়া, চাঁড়ে এবং বেদিয়া। একই গোত্রের মধ্যে এদের বিবাহ নিষিদ্ধ। গোত্রগুলি আবার বিভিন্ন উপগোত্রে বিভক্ত। উপগোত্রকে এরা বলে খুঁট। সাঁওতালদের দেবদেবীর অন্ত নেই। প্রধান দেবতা 'ঠাকুর'। ঠাকুরকে এরা বিভিন্ন নামে ডাকে -কান্দো, সিন কানেজা, সিন বোগতো ইত্যাদি। এদের বড় উৎসব অনুষ্ঠানের নাম 'সোহরাই'। এছাড়া রয়েছে বাহা পরব, সাকরাভ, মাঘসীম, যাত্রা পরব, ছাতা পরব, পাতা পরব, করম পরব ইত্যাদি।

টোটো ঃ পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট ব্লকের টোটো পারায় এদের বসবাস। টোটোদের বাড়িগুলো কাঠের খাঁচার ওপর তৈরি করা হয়। মিলেটের তৈরি মারুয়া নামক এক ধরণের খাবার এদের প্রধান খাদ্য। শিকার এদের প্রধান জীবিকা। টোটোদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। এরা প্রায় ১৩ টি গোত্রে বিভক্ত ডান কোরেই দানব্রোবেই, বুদ্ধতেই প্রভৃতি। টোটোদের দেবতা হল - ইস্পা। 'চোইমা' নিজেদের হিন্দু বলে। ইস্পার উপাসনা ঘরের বাইরে এবং চেইমার উপাসনা ঘরের ভেতর করা হয়। টোটোরা মঙ্গোলীয় প্রজাতির, চ্যাপ্টা নাক, প্রশস্ত কপাল, মাঝারি উচ্চতা ও কালো ছোট চোখ বিশিষ্ট।

মুন্ডা ঃ মুন্ডা নামের অর্থ সঙ্গতিসম্পন্ন চাষী বা সমৃদ্ধশালী মানুষ। গ্রামীণ মোড়লকে মুন্ডা বলা হয়। এরা নিজেদের হড়োকো নামে অভিহিত করে যার অর্থ মানুষ। এদের ভাষা মুন্ডারী। এদের গায়ের রং বাদামী মধ্যম উচ্চতা, ঢেউ খেলনো চুল, দীর্ঘমস্তক ও চওড়া নাক। ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে এরা বসবাস করে। বসতবাড়ির সঙ্গে মালিয়ান থাকে যেখানে ধান ঝাড়াই ও অন্যান্য কৃষিকাজ হয়ে থাকে। গ্রামের শেষ ভাগে থাকে শালকুঞ্জ যাকে 'সরণা' বলে। গ্রামের মাঝে থাকে নৃতাঙ্গন যাকে 'আমরা' বলা হয়। মুন্ডা মেয়েরা সমস্ত শরীরে উল্কি আঁকতে

পছন্দ করে। জামা কাপড় রাখার জন্য মুন্ডারা বাঁশের তৈরি বাক্স তৈরি করে। এরা সাধারণত কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। আগে এরা শিকার করত। মুন্ডারা ১৩ টি ভাগে বিভক্ত - কোল মুন্ডা, মাড়িয়া মুন্ডা, করঙ্গা মুন্ডা, মাহালি মুন্ডা ইত্যাদি। পরিবার পিতৃতান্ত্রিক। বহু অনুষ্ঠান ও গান ভোজনের মধ্য দিয়ে বেশ কদিন ধরে বিবাহ অনুষ্ঠান চলতে থাকে। মুন্ডাদের গ্রামে পাঁচজনের একটি পরিষদ হয় যা 'পঞ্চ'নামে পরিচিত। এরা হল - মুন্ডা বা প্রধান, পাহান বা পুরোহিত, মাহাতো এবং সংবাদদাতা। মুন্ডাদের প্রত্যেকটি ঘরেই বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, যেমন মাদল, বাঁশি, ধামসা ইত্যাদি থাকে।

লোধা ঃ পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম, নয়াগ্রাম, কেশিয়ারী প্রভৃতি অঞ্চলে, ওড়িশার ময়ূরভঞ্জে এবং ঝাড়খন্ডের সিংভূম জেলায় লোধা উপজাতিদের বসবাস। লোধাদের গায়ের রঙ ঘন বাদামী, মাথা লম্বা ও চওড়া, ঘন কালো ঢেউ খেলানো চুল ও স্বল্প উচ্চতা বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এরা নিজেদের শবর বলে পরিচয় দেয়। পান্তাভাত লোধা উপজাতিদের প্রধান খাদ্য। মহুয়ার তৈরি মদ এবং ভাত পচিয়ে তৈরি হাঁড়িয়া এরা পানীয়রূপে খায়। এদের বাড়িগুলিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো জানালা থাকে না। লোধাদের প্রত্যেকটি গ্রামে বা পাড়ায় বরাম থানা (অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্থান) থাকে। লোধারা লোহার কড়াই ব্যবহার করে থাকে বলে চাঙ্গাল। বনজ ফলমূল সংগ্রহ এবং জীবজন্তু শিকার ছিল লোধাদের প্রাথমিক জীবিকা, কিন্তু বিভিন্ন বন সংরক্ষণ আইন চালু আইন হওয়ায় এদের বনে অবাধ প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। পাখি শিকারে লোধারা খুবই পটু। সরু ও লম্বা পাঠকাঠি মাটিতে গোলাকারে পুঁতে রাখে ও মাঝে পাখির খাবার ছড়িয়ে দেয়। পাখি সেই খাবার খেতে আসলে আঠা পালকে আটকে যায় এবং তারা আর উঠতে পারে না। লোধা উপজাতিদের মধ্যে নয়টি গোত্র দেখা যায়। যেমন নায়েক, দিগার, ফল্লিব, কোটাল, দন্ডপাট, ভুঁইয়া পারমানিক, আড়ি প্রভৃতি। ভক্তা গোত্রের দেবতা চিরকা আলু, দন্ড পাটের কোটালের চাঁদ ও গঙ্গা ফড়িং। কোনো গোত্রের দেবতার নাম খাদ্যবস্তু হলে লোধারা তা কখনই ভক্ষন করে না।

ভীল ঃ ভারতের উপজাতিদের মধ্যে সাঁওতাল ও গন্ডাদের পর তৃতীয় স্থানে ভীল উপজাতি রয়েছে। ভীল শব্দের উৎপত্তি দ্রাবিড় শব্দ 'বিল' থেকে যার অর্থ ধনুক। প্রাচীনকালে দক্ষিণ রাজস্থানে ভীলদের শাসন ছিল। বীর, সাহসী ও বিশ্বস্ত সৈনিক হওয়ায় এরা রাজা ও জমিদারদের স্নেহভাজন হয়ে যায়। ভীলরা মূলত পার্বত্য অধিবাসী যারা সাতপুরা, বিন্ধ্য এবং আরাবল্লী পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করে। এরা রাজস্থান, গুজরাট, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, উত্তর মহারাষ্ট্রে বাস করে। ভীলরা লম্বা ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। এদের গায়ের রঙ তামার মতো। এদের মূল জীবিকা পশুচারণ ও বন্য জিনিস সংগ্রহ। বর্তমান স্থায়ী কৃষিকাজে এরা যুক্ত হয়েছে। মোটা শস্য যেমন ভুট্টা, বাজরা, ছোলা, শাকসব্জি,পশুর মাংস, ফলমূল প্রভৃতি ভীলদের প্রধান খাদ্য। এরা নিপুণ শিকারী হয়ে থাকে। উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে বসবাসের জন্য এদের জামাকাপড় কম পরতে হয়। মহিলারা গলা, হাত ও পায়ে পিতল, তামা এবং মিশ্র ধাতুর গহনা পড়ে। হাতির দাঁতের চুড়ি এবং রূপোর বালা পরে। একটি গ্রামে ভীলদের শুধুমাত্র একটি গোত্রের লোকেদের ঝুপড়ি থাকে। এরা গ্রামকে পাল বলে। ভীলদের সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। বংশ বা কুলের পৃথক নাম হয়ে থাকে। যা ফুল এবং পশুদের নামে রাখা হয়। প্রত্যেকে কুলের পৃথক পৃথক চিহ্ন (Totem) হয়। ভীলদের অধিকাংশ হিন্দু দেবদেবীর পুজো করে থাকে, যার মধ্যে হনুমানের পূজো সর্বাধিক। ভীলদের বিয়ের সময় ছেলের বাবা মেয়ের বাবাকে কিছু উপহার স্বরূপ মুল্য প্রদান করে যা বধূমূল্য নামে পরিচিত। ভীলদের মধ্যে বহুবিবাহ ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত রয়েছে। মৃতদেহ সৎকার করা হয়। চিতায় দেহটি উত্তরে মাথা রেখে শোয়ানো হয় এবং মুখে মদ দেওয়া হয়। বট এদের সবচয়ে পবিত্র বৃক্ষ। হোলি ও দীপাবলী ভীলদের প্রধান উৎসব।

গন্ড ঃ ভারতের মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়ের মালভূমি এবং অরণ্য অঞ্চলে গন্ড উপজাতিদের বসবাস। এরা ভারতের উপজাতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে উন্নত। 'গন্ড' শব্দটি তেলেগুশব্দ, 'কোন্ডা' থেকে এসেছে, যার অর্থ পর্বত। গন্ডদের মধ্যে মুরিয়া, ভাটরা, বাইসন, হর্ণ- মারিয়া, পারজা বাধুরা এবং দোরলা সহ পাঁচটি শ্রেণী রয়েছে। গন্ডদের গায়ের রং কালো, কপাল গোল, নাক ছোট ও চওড়া, মুখ চওড়া এবং ঠোঁট ছোট। মাথায় চুল কালো এবং সোজা।এদের মুখাকৃতি মোঙ্গলদের মতো এবং শারীরিক গঠন দ্রাবিড়দের মতো হয়ে থাকে। প্রধান জীবিকা পশুপালন এবং বন্যপ্রাণী শিকার থেকে এখন কৃষিকাজ হয়েছে। এদের স্থানান্তর কৃষিকে 'দিপ্পা' বলা হয়। পাহাড়ের ঢালে যে চাষ করা হয় তাকে 'পেন্ডা' বলে। এরা মূলত মোটা দানা যুক্ত ,তামাক, শাক সবজি চাষ করে। এদের প্রধান খাদ্য ভাত এবং জোয়ার। এরা ভাতের তৈরী তরল খাদ্য যা পিজা বা জাভা নামে পরিচিত তা খাদ্য রূপে গ্রহন করে। এরা তেঁতুল, আম, তালের আচার ছাড়াও লাল ও সাদা পিঁপড়ের আচার খায়। গন্ড পুরুষরা ধুতি এবং মহিলারা শাড়ি পরে। মহিলারা লোহা ও পিতলের তৈরি শিকল জাতীয় গহনা পরিধান করে। এরা শরীরে বিভিন্ন ট্যাটু অঙ্কন করে থাকে। রাজগন্ডদের স্থান সমাজে সবচেয়ে উঁচুতে, সারা চাষবাস করে। ধুরগন্ডও কৃষক কিন্তু এরা ভূস্বামী হয় না। শ্রেনী বিভাজন থাকা সত্ত্বেও গন্ডদের মধ্যে সামাজিক বিভেদ কম হয়ে থাকে। গন্ডদের মধ্যে সাধারণত একবিবাহ প্রথা প্রচলিত। জেলাম গন্ডদের প্রথা অনুযায়ী পাত্রপাত্রীকে জোর করে নিজের ঘরে নিয়ে আসে এবং বিবাহ করে। বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে ছোট ভাইকে বিবাহ করতে হয়। গন্ডদের গ্রামে অবিবাহিত যুবক যুবতীদের জন্য পৃথক পৃথক ঘর থাকে। যা ঘোটালু নামে পরিচিত। এরা যৌন সম্পর্ক এবং বিবাহের দিক থেকে খুবই উদার প্রকৃতির হয়ে থাকে। মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়ার প্রথা প্রচলিত। এদের মতে মানুষ মরার পরে আরাধ্য দেবতার কাছে যায় যারা উত্তরের দিকে বসবাস করে। গন্ডরা ধর্মভীরু এবং বিভিন্ন দেবদেবী পুজো করে। এরা অন্ধবিশ্বাসের কারণে ভূতপ্রেত বিশ্বাস করে। পশুবলি দেয়। বিবাহ ও অন্যান্য উৎসবে এরা মহুয়ার তৈরি মদ ও তাড়ি পান করে এবং নাচ গান করে থাকে।

টোডা ঃ- দক্ষিন ভারতের নীলগিরি পর্বতে টোডা আদিবাসীদের বসবাস। টোডাদের উৎপত্তি বিষয়ে মনে করা হয় টোড গাছকে যারা পুজো করে তারাই টোডা। এদের পায়ের রঙ হালকা বাদামী, সরু ও উন্নত নাক, লম্বা মাথা, ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল, ডিম্বাকার মুখ, পুরুষের দেহ ও মুখমন্ডলে লোমের আধিক্য। এদের মাতৃভাষা হল টোডা। এরা নিজেদের ভাষাকে গুলফোস বলে। টোডা পুরুষেরা সাদা ও মোটা কাপড় জড়িয়ে তার একপ্রান্ত কাঁধের উপর তুলে দেয়। এটাই হল তাদের চিরাচরিত রীতি। এর সাথে লাল, নীল, কালো ডোরাযুক্ত লম্বা বহির্বাস নেয়। মেয়েরা মোটা শাড়ি পরে। মেয়েরা লম্বা বিনুনী করতে ভালোবাসে। তামা, রূপা, সোনার তৈরি কানবালা, হার, আংটি এদের প্রধান অলংকার। মেয়েরা দেহে উল্কি নিতে ভালোবাসে। সাধারণত বন বা নদীর ধারে উঁচু জায়গায় এদের গ্রাম হয়। ছয় বা আটটি পরিবার নিয়ে গঠিত হয় এক একটি গ্রাম। বাড়িগুলির আকৃতি অর্ধচোঙাকৃতি, সাধারণত ৩মিটার উঁচু, ৬ মিটার লম্বা ও ৩ মিটার চওড়া। এদের ঘরে কোনো দরজা বা জানালা নেই। বাঁশ ও বেত দিয়ে দেওয়াল ও চালের কাঠামো করে শুকনো লতা পাতা দিয়ে ছাওয়া হয়। মোটা কাঠ বা পাথর বা শক্ত কাঠের তক্তা দিয়ে ঘরের পিছনে ও সামনের দিকে আটকানো থাকে।

টোডারা চালকে দুধের মধ্যে সিদ্ধ করে খায়। এদের প্রিয় খাদ্য পায়েস, ছানার জল, সুরুয়া, ভাত,দুধ, দই, ঘোল। এরা মূলত নিরামিষাশী। কেবল বছরের একদিন ধর্মীয় উৎসবের সময় তারা মোষের মাংস খায়। মেয়েদের বয়স ৫-৬ বছর হলে তার বিবাহের যোগাযোগ শুরু করে। ১৫-১৬ বছর পর্যন্ত মেয়েকে বাপের বাড়িতে রাখা হয়। নারীর সংখ্যা কম বলে এক নারীকে টোডারা সব ভাই মিলে বিয়ে করে। স্ত্রীকে পালা করে প্রত্যেক স্বামীর কাছে থাকতে হয়। পরিবারের সবচেয়ে ছোট ভাই নিজের পছন্দমতো বিয়ে করে। টোডাদের মহিষকেন্দ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য তারা নৃতত্ত্ববিদদের নজর কেড়েছে। এরা মোষ পালনের উপর নির্ভরশীল।

কবিতা

নিজস্বতা

বৃষ্টি মন্ডল
(অধ্যাপিকা, শিক্ষা বিজ্ঞান)

ধন্যি আমি ধন্যি মেয়ে সত্যিই বড়ো আজব,
সবাইতো তাই আমায় নিয়ে করে অনেক গুজব।
রাস্তাঘাটে চলতে গিয়ে শুনতে না হয় কতই কথা
সত্যি বলতে, ওসব কথা শুনে আমার লাগেনা আর ব্যথা।
সমাজতো বলবেই তাদের নিজের বক্তব্যতা
তাই বলেকি ছেড়ে দেবো নিজের স্বাধীনতা।
যারা আজ তুলছে আঙুল আমার চরিত্রটায়
তারাই বা কি রয়েছে নিজের নিজস্বতায়?
যারা আমায় দিয়েছে শুধু একগুচ্ছ অপবাদ,
তাদের বিরুদ্ধে করবো আমি আমার নিজের প্রতিবাদ।
সমাজতো বদলায়নি, রয়েছে ঠিক নিজের মতই
যেমন ছিলাম তেমন আছি থাকবো আমিও তেমনই।
মানবোনা হার, মানবোনা এই সমাজের বাধ্যকতায়
রইবো আমি আমার মতো নিজের নিজস্বতায়।।

সংকেত

ভবানী শঙ্কর নায়ক
হিসাব রক্ষক, গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়

যেখানে অর্থ নেই সেখানেই শব্দ বেশি,
অর্থের অভাব শব্দে পুষিয়ে দেওয়া কোন দেশি?
মন্ত্র পাঠ কানে উৎকট বাজে, মোল্লাদেরও
মাইক্রোফোন লাগে, আজান দেওয়ার কাজে।
ডেসিবল ৭৫ থেকে ১২৫ করা যেন জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি,
বয়স্ক অসুস্থদের নাভিশ্বাস, অধিকাংশ শিশুরাও হারাচ্ছে অনেক অনুভূতি ।
ডিজে জলসার শব্দবাজি ভেঙেছে বর্ধিত ডেসিবেলেরও উর্ধ্বসীমা,
কলেজেরই মাঠে বার্ষিক খেলাতেও অতিক্রান্ত অনধিকার প্রবেশের শেষ সীমা।
বেআইনি জবরদখল হটাতে প্রশাসনিক সাহায্যে বহুবিধ কটাক্ষ,
ভাষা সন্ত্রাস, অপ্রিয় মন্তব্য, মিথ্যা ভাষণের সরকারি দপ্তরও সাক্ষ্য
এক কথায় কোন কোন ক্ষেত্রে অসামর্থই বাড়ায় ঘৃণ্য আস্ফালন,
উচ্চ শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারই এসবের প্রকৃত প্রক্ষালন।

গল্প

সেই আশ্চর্য বৃষ্টির রাত

অদিতি দাস
(১ম সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ)

বাইরে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো, এখনো অফিসের দুটো খাতায় হিসেব রাখা বাকি, না! আর পারছিনা বলে বৃন্দাবনদাকে ডেকে বললাম- বৃন্দাবনদা আজ অনেকটা রাত হল, স্যারকে কাল সব হিসেব বুঝিয়ে বলে দেব। বৃন্দাবন দা হল আমাদের অফিসেরই একজন বহু পুরানো ও বিশ্বস্ত কর্মচারী। সে সবার প্রথম অফিসে আসে আর সবার শেষে বাড়িতে ফেরে। বৃষ্টিটা খানিকটা দাঁড়িয়েছে বলে মনে হচ্ছে বুঝলে, সাইকেলের চাকায় বেশি পাম্পও নেই, এবার আমি উঠি। বৃন্দাবনদা সব খাতাগুলো টেবিল থেকে সরিয়ে আলমারিতে তুলে রাখলো। আমিও জেনারেটর ঘর থেকে সাইকেলটা বের করে আনতেই বৃন্দাবনদা বললে- রাত্রি তো অনেক হল বাবু, ওই বড়ো পুকুরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, একবারও কোথাও দাঁড়াবেন না। ওখানের রাস্তা নাকি ভালো না। আমি অট্টহাসি হেসে বললাম- বৃন্দাবনদা গ্রামের মানুষদের সাথে তুমিও মিলিয়েছো তবে!

তারপর আমিও বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তা ঘন অন্ধকার, কোথাও কোন আলো দেখা যাচ্ছে না। সারা গ্রামে লোডশেডিং, অন্ধকার রাস্তায় ঝি ঝি পোকার ডাক। আমার সাইকেলের ক্যারিয়ারের স্ক্রু গুলো আলগা থাকায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ একটা শব্দ আর প্যাডেলের বনবন একটা আওয়াজ নির্জন রাস্তায়। সাইকেলের চাকায় পাম্প না থাকায় সাইকেল বেশি জোরে চালাতে পারছি না। হঠাৎ দেখি আবার ঝমঝম বৃষ্টি। একটা মোটা ঝাপঝুপে বট গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। বৃন্দাবনদার কথা একবার মাথায় এলেও ব্যাপারটা আমি এড়িয়ে যাই। সারা শরীর ভিজে অবস্থায় পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছতে যাব ওমনি কে যেন পিছনে ডেকে বলল- বাবু অফিসে গিয়েছিলেন? একটা মৃদু গলার স্বর। আমি তার মুখ চোখ না দেখেই টর্চ লাইটটা তার মুখের দিকে মারতেই মেয়েটি তার মৃদুস্বরে বলে উঠল- বাবু আমি চোখে ঠিকমতো দেখতে পাই না। আপনার টর্চের তীব্র আলোয় আমার চোখ জ্বালা করে, তবে আমি আবছা আবছা দেখতে পাই। ওই যে পুকুর পাড়ে আমার বাসন রাখা আছে ওগুলো মাজতে এসেছি। আপনার ওই জোরালো টর্চ লাইট টা দিয়ে কিছুটা পথ যদি এগিয়ে দেন, তাহলে ভালো হয়।

আমিও ভীষণ দয়ালু প্রকৃতির মানুষ। কারো কথায় না নেই। একা মেয়ে বলতেই আমি রাজি হয়ে যাই। মেয়েটিকে বললাম, আমি যাচ্ছি তুমি চলো। মেয়েটি জোর গলায় বলে উঠলো আমি আগে যাব না, চোখে ঠিকমতো দেখিনা। এদিকে আবার বৃষ্টির রাত। আপনি টর্চের আলো দেখিয়ে দিন, আমি আপনার পিছনেই যাচ্ছি। আচ্ছা বেশ, বলে আলো এগিয়ে দিলাম। আমি যেতে যেতে প্রশ্ন করলাম আচ্ছা এই ঝম্ ঝম্ বৃষ্টির মধ্যে তুমি একা মানুষ বাড়ির বাসন ধুতে এসেছো ? তোমার স্বামী আসেনি কেন? বাবু আমি যে বললাম চোখে ঠিক মতো দেখি না। আহা তার জন্যই তো বললাম এই রাতে এসেছো বাসন ধুতে ? আসলে বাবু আমি আমার বাপের বাড়ি ছোট মেয়ে হওয়ায় আমার বড় দিদির বিয়েতে বাবা সব টাকা শেষ করে ফেলে। আমার বিয়ের চিন্তা মাথায় নিয়ে বাবা মারা যান। আমার বিয়ে দেন আমার কাকা। কাকা বিয়েতে সেরকম কিছুই পন দিতে পারেন নি। আবার আমিও অন্ধ বলে অনেক অপমান সহ্য করতে হয়েছে। আমার বাপের বাড়ির নিন্দে শুনতে শুনতে ও স্বামীর অত্যাচারে আমি প্রতিনিয়ত শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম সব কষ্ট বুকে নিয়ে বাবু।

মেয়েটির কথাগুলি শুনে চোখে জল এসে যায়। চোখের জল মুছতে মুছতে বলি তারপর? বাবু তারপর ওই যে বড় পুকুরের ডুব দিলাম, আর উঠিনি। সেদিন থেকে পরিবারের নিন্দে ও অন্ধত্বের অপমান আর সহ্য করতে হয়নি। মেয়েটির শেষের দুটো কথা শুনে আমার হাড় হিম হয়ে গেল। পিছন ফিরে তাকাতে দেখি একটা অবয়ব ছুটে চলে গেল ওই বড় পুকুরের দিকে। সারা শরীর আমার থরথর করে কাঁপছে। টর্চ লাইটটা হাত থেকে পড়ে গেল, সাইকেলটা মাটিতে ধপাস করে পড়ে গেল। আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম, তারপর আর কিছু মনে নেই। তারপরের দিন সকালে উঠে দেখি আমি খাটের একপাশে শুয়ে, আমার স্ত্রী আমার পাসে বসে মাথায় জল পটি দিচ্ছে, গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। স্ত্রী বলল কাল নাকি পাড়ার চৌকিদার নাটুকাকা আমায় বড় পুকুরের পাড়ের থেকে উদ্ধার করেছে। আমার শরীর সপসপে ভিজে কাদা মাখা অবস্থায় পাওয়া গেছে। আমার স্ত্রী বলল ওই রাস্তা দিয়ে আর কখনো আসবে না। ওখানে নাকি রাত হলে বাসন ধোয়ার আওয়াজ শোনা যায়। আমি মুচকি হেসে অবজ্ঞার সুরে বললাম ওগুলো সব ভুয়ো গল্প।

কবিতা

প্রভাতবেলা

সোমনাথ গরাই
(প্রথম সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ)

প্রভাতবেলা মেলছে ডানা
পক্ষী নীলাম্বরে
শান্ত সমীর নাড়ছে পাতা
আহ্বানের মিষ্টি সুরে
নানা রঙের ফুলগুলি সব
দুলছে মাথা তুলে
মৌমাছিরা গুণগুনিয়ে
বসছে ফুলেফুলে
নিদ্রা ভেঙে যাচ্ছে চাষি
বলদ নিয়ে মাঠে
অরুণ রবির সোনালি কিরণ
ঝরছে মেঘের বাটে
প্রভাতবেলা ফিরছে জেলে
মাছ ধরে নিজ ঘরে
ছোটা খোকা পড়ছে "অ-আ"
উঠছে দুলে দুলে।

গাছের ধর্ম

লক্ষ্মী গরাই
(প্রথম সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ)

গাছের স্বপ্ন হচ্ছে ভাঙ্গা
আমাদের পরিবেশে
প্রাণ বিকিয়ে বেড়ে ওঠে
প্রাণ যায় অবশেষে।
ফুলে ফুলে দেয় ভরিয়ে
প্রাণ বিনিময় তার
চায় যে শুধু আলো বাতাস
কিছু তো নয় আর।
বিছিয়ে ছায়া শীতল বায়ু
সোহাগ ছড়ায় ভুঁয়ে
ঘাম মুছে নেয় ক্লান্ত পথিক
শান্ত খানিক শুয়ে।
মারণ বায়ু শোষণ করা
এই তো গাছের ধর্ম
গাছের ওপর আঘাত হানা
এই মানুষের কর্ম।

কবিতা

জ্ঞানের লাইব্রেরি

পূজা দাস

বই কথা বলে নিজের ভাষায়,
নিজের জ্ঞানের ছাপ রেখে যায়
পাতায় পাতায়।
নিজের চোখে স্বপ্ন দেখায়,
নিজের মুখে কথা বলায়।
এ বই না জানি কী কী বলে
ও দেখিয়ে যায়,
কখনো পড়লে কোনো বিপদে,
বই আমাদের পথ দেখায়
সাথে সাথে,
বই বন্ধু, বই সঙ্গী, বই আমাদের
জ্ঞানের লাইব্রেরি।

স্বপ্ন

সোনালী কর্মকার

সব চাওয়া কি মেটে জীবনে ?
আমিও একটা সুন্দর জীবন গড়তে চাই,
লুকোচুরি ভরা এই জগতের কোথাও যেন হারিয়ে গেলাম,
বই আর বইয়ের কঠিন ভারে
সব হারানোর স্তূপে অসহায় জীবনে বদ্ধ হলাম।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় অশনি সংকেত-
যোগ্যদের সরিয়ে অযোগ্যের আস্ফালন।
আজও তো রয়েছে কোমল হৃদয় ভরা যোগ্য মানুষ,
সোনার স্বপ্ন বুকে নিয়ে সফল জীবন গড়ার কারিগর।
যোগ্যকে তুচ্ছ না করে বসাও সম্মানের আসনে,
সমাজের বুকে দাও প্রতিষ্ঠা ন্যায় বিচারের মানদন্ডে ,
স্বপ্ন বেচার ফেরিওলাটা যে ডাক দিয়ে যায়
মনের গহীন অন্তরে।।

বন্ধু

প্রিয়া হালদার

বন্ধু মানে হাজার বৃষ্টির পর
শরৎ কালের আকাশ,
বন্ধু মানে বইতে থাকা
ভালো থাকার বাতাস।
বন্ধু মানে তোর কী হয়েছে?
সত্যি করে বল,
বন্ধু মানে ধুর, কিছু হয়নি
আবার নতুন করে শুরু করি চল।

সাঁওতালী সেরেঞ

রীড়দঃ সাঁওত্বঃ আঁরি সিরিঞ

নীলিমা হেম্বরম

(i) সিদু কানু তিলকাঁঃ
মারাং বুরু বিরসাঁঃ
ধারতী ধুড়ী রেপে
জানাম্ লেনা হো
মঞ্চপুরী রেপে উপেল লেনা ॥
ii) দিশোম্ দহয় লাগিদ্
সাঁওত্বাঃ সুশীর লাগিদ্
হড়মঃ মায়াম্ দঃপে
লিঙ্গী লেদা হো
হড়মঃ জিয়ী দঃপে
আলায় লেদা হো... ।
iii) আপে লাগিদ তেদঃ
লাগাম সাকাম রেদঃ
ঠাঁওদঃ মেনা রেঁহ
ঠাঁওদঃ বানু ..... ॥

গল্প

কাজের মূল্য

পল্লবী নায়ক
(৩য় সেমিস্টার)

গ্রামের নাম রানীপুর। সেখানে থাকতো দুই প্রিয় বন্ধু। একজন ছিল নবীন আরেকজন ছিলো রতন। নবীন পড়াশোনায় খুব ভালো সে সবসময় পড়াশুনা করতে চায় ওদিকে রতন ততোটা পড়তে ভালোবাসেনা। সারাদিন খেলাধূলা নিয়েই থাকে। তারা একদিন গল্প করছে, আমি বড়ো হয়ে তারা একসাথে সব জায়গাই ঘুরবে। এরপর দ্বারা আস্তে আস্তে স্কুলের গন্ডি পেরোলো এবং ডিপ্লোমা করার জন্য একই কলেজে ভর্তি হলো। নবীন সবসময় কলেজে থেকে আসার পর বেশিরভাগ টাইম বই নিয়ে থাকতো, এদিকে রতন কলেজে গিয়ে ক্লাস না করে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতো, মজা করতে। একদিন নবীন রতন কে বলছে-কীরে রতন পড়াশুনা করছিস না, এমনি করলে ফেল করে যাবি কিন্তু। তুই কিছুক্ষন পড় আর কিছক্ষন আড্ডা দে তাহলেই হলো তো। এটা শুনে রতন বললো- এটাই তো মজা করার সময় রে, এখন করবো না তো বুড়ো হলে করব কী! এভাবে দিন কাটতে লাগলো। নবীন কলেজের বিভিন্ন প্রজেক্ট -এ ভালো নাম্বার পেতে শুরু করলো। আর এদিকে রতন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, সিনেমা দেখে এই করেই দিন কাটাত।

এই করে তিন বছর কেটে গেলো। নবীন একটা ভালো কোম্পানিতে ভালো বেতনের চাকরি পেলো। রতন কে কোনো কোম্পানি চাকরি দিলো না তার নাম্বার কম ছিল। আস্তে আস্তে নবীনের গাড়ি, বাড়ি সব হলো। রতনের কাছে আর টাকা না থাকাই সে কলেজে পড়তে পারলো না। টাকা জোগাড়ের জন্য তাকে একজায়গায় ১২ ঘন্টা ডিউটি করতে হয়, তাঁর আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া মজা করা কিছুই হয়ে উঠেনা। নবীনের অফিস ছুটি থাকলেই সে এখন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। একদিন সে রতনকে সিনেমা দেখতে যাবার জন্য ডাকতে যায়। তখন রতন বলে তাঁর কাছে এখন সময় নেই। তখন সেই উত্তরে নবীন বলে- তুই সময় থাকতে সময়ের মূল্য দিসনি তাঁই আজ এরকম দিন দেখছিস। একটা কথা সবসময় মনে রাখবি মানুষকে সঠিক সময়ে সেই কাজের সঠিক মূল্য দেওয়া উচিত তবেই মানুষ সফলভাবে সেই কাজের সাফল্য পাবে।

আমার মহাবিদ্যালয়

অমর্ত্য মন্ডল

সোমবার মানে কিছু মানুষের জন্য
একদিন ছুটির পরে আবার কাজে ফেরার সাজা,
কিন্তু আমার জন্য সোমবার মানে
একদিন মহাবিদ্যালয়কে না দেখার পরে আবার
দেখার মজা ।
আমি যখনই মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করি
অনেক মানুষের সাথে হয় দর্শন,
গাছপালা, দু-চাকার যান, শ্রেণিকক্ষ
এদের সাথেও হয় কথোপকথন।
আমাদের মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক - অধ্যাপিকারা
খুব ভালোভাবে করেন শিক্ষাদান,
এজন্য তাদের আমরা
এতো ভালোবাসি, এত করি সম্মান।
তৃতীয় বর্ষের পর
আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করব,
আমি জানি না কীভাবে
আমার মহাবিদ্যালয়কে ছেড়ে থাকব?
আমি আমার মহাবিদ্যালয় যখনই যাই
আমার মুখে ফোটে হাসি,
বলে বোঝাতে পারব না
আমি আমার মহাবিদ্যালয়কে কতটা ভালোবাসি।

আমার ছোট্টবেলা

আনন্দ ভট্টাচার্য্য
(৫ম সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ)

হঠাৎ একদিন স্বপ্নে আমার ছোট্টবেলা
কানে কানে বলে গেল–
কইরে কেমন আছিস ?
খুব ভালো আছিস তাই না ?
একদিন না চেয়েছিলি অনেক অনেক বড় হতে।
আমায় ছেড়ে চলে যেতে অনেক অনেক দূরে।
আজতো অনেক বড় হয়েছিস তাই না ?
বড় হয়ে খুব ভালো লাগছে তাই না বন্ধু।
আজ হয়তো আমায় মনে পড়ে না।
হয়তো আর মনে পড়ে না সেই দিনগুলোর কথা।
মনের দুঃখে কৈশোর বলে উঠল,
কী আর বলবো বন্ধু মনের কথা
হয়তো ভুলই হয়েছে বড় হতে চেয়ে।
বন্ধু আমার আজও মনে পড়ে
সেই ফেলে আসা দিনগুলোর কথা
মায়ের স্নেহ, বাবার আদর
আজও মনে পড়ে বালি, ধুলোয় খেলা করে
ছুট্ট যেতাম মায়ের কোলে।
সন্ধ্যা বেলায় দাদু- ঠাকুমার কাছে শুনেছি কতোনা গল্প
ভূত-পেতনি, দত্যি-দানব, রূপকথার কতোনা গল্প।
বিদ্যালয় ছুটির পরে সারাটা বিকেল
বন্ধুদের সঙ্গে শুধুই খেলা আর খেলা।
ছিলনা কোনো কাজ, ছিল না কোনো দায়িত্ব,
জানো বন্ধু, আমি যখন একলা থাকি,
মনে পড়ে তোমার কথা সেই ছোট্ট বেলার কথা
সত্যি বলছি প্রিয় বন্ধু আমার
মাঝে মাঝে মনে হয়
আবার যদি ফিরে পেতাম সেই ছোট্ট বেলা।

আধুনিকতা

সহেলী রায়
(প্রথম সেমিস্টার, ইংরেজী বিভাগ)

আধুনিকতা মানে স্ট্যাটাসের নীচে মস্ত একটা ক্যাপশন দেওয়া নয়
বরংচ ঠিক সময়ে দেওয়া মনুষ্যত্বের পরিচয়।
আধুনিক কি শুধু ব্র্যান্ডেড জুতো আর জামা পরলেই হয়
না আসলে তা নয়।
আধুনিকতা কি শুধু সমাজের কাছে নিজেকে জ্ঞানী
প্রমান করার অভিনয়।
নাকি অন্যের বিপদে এগিয়ে গিয়ে দেখানো
নিজের নৈতিকতার পরিচয়।
চারটে ইংলিস কথা বল্লেই কী আধুনিক কেউ হয়
না আসলে তা নয়।
আধুনিকতা মানে বন্ধুদের সাথে তাল মিলিয়ে
western culture ই ভালো বলে গা ভাসালেই হয়।
নাকি চোখে চোখ রেখে বলা নিজের রীতি নীতি মেনে চলতে
কীসের লজ্জা আর কীসেরই বা ভয়।
ঠোঁটে দামি Lipstick আর গালে ক্রিম দিলেই কি আধুনিক কেউ হয়
না আসলে তা নয়।
আমরা যা ভাবছি তা আসলে আধুনিকতা নয়
বরংচ সময়ের সাথে হয়ে যাওয়া মানুষের মনুষ্যত্বের অবক্ষয়।

মা

রিয়া ঘোষ
(প্রথম সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ)

যার গর্ভেতে জন্ম নিয়েছি
দেখেছি পৃথিবীটাকে
দেখিনি দেবতা, দেখেছি আমার
জন্মদায়িনী মাকে।
খুঁজি না এখন মক্কা মদিনা
মন্দির কাশিধাম
মায়ের মাঝেই খুঁজে পাই আমি
আমার-আল্লা রাম।
তুমিই আমার প্রিয় দেবতা
শান্তির সমভুমি
স্নেহময়ী মাগো, আমার জীবনে-
শ্রেষ্ঠ প্রেরনা তুমি।

প্রবন্ধ

নৃত্য

সপ্তমী সিংহ (প্রথম বর্ষ)

ভারতে ১৫ রকমের নৃত্য আছে। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের নৃত্য পরিবেশন করা হয়। তার মধ্যে ছয় রকমের নৃত্য উল্লেখযোগ্য। সেগুলো হলো ভরতনাট্যম, কত্থক, কথাকলি, মণিপুরী, কুচিপুড়ি এবং ওড়িসি। প্রত্যেকটাই ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্য। ভরতনাট্যমকে ভারতের জাতীয় নৃত্য ধরা হয়।

এছাড়া আছে, বিভিন্ন ধরনের লোকনৃত্য। সেগুলো হলো পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ছৌ নৃত্য, লাবনী, কারাকাট্টাম, আসামের বিহু, রাসলীলা প্রভৃতি

ভরতনাট্যম:- ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যকলাবিশেষ। দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যে এ নৃত্যকলার উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারনা করা হয়। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রধান চারটি ধারার একটি। বাকি তিনটি হচ্ছে কত্থক, কথাকলি, মণিপুরী। ভরতনাট্যমে ভাব, রাগ ও তালের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। অনেকের মতে এই তিনটা শব্দের প্রথম বর্ণকে নিয়ে ভরতনাট্যম শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। অন্য অনেকে মনে করে যে ভরত মুনি এর প্রবর্তন করেছিলেন বলে এই নৃত্যকলার নাম ভরতনাট্যম হয়। অন্যান্য ভারতীয় নৃত্যধারার তুলনায় ভরতনাট্যমের ভাবধারা মূলত ধর্মভিত্তিক ও দেবতাকেন্দ্রিক। ভরত মুনির লেখা নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থে ভরতনাট্যম নাচের কিছু কৌশল, মুদ্রা ও সংজ্ঞা বর্ণনা রয়েছে। মহাদেব শিবকে এই নৃত্যশৈলীর ভগবান মানা হয়। আজ ভরতনাট্যম বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় নৃত্যশৈলী।

কত্থক: ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্য-নাট্যের অন্যতম প্রধান রূপ। অন্যান্য প্রধানগুলি হল ভরতনাট্যম, কথাকলি, মনিপুরি, কুচিপুড়ি এবং ওডিসি। কত্থক উত্তর ভারতের আদিবাসী এবং হিন্দু ও মুসলিম উভয় সংস্কৃতির প্রভাবে বিকশিত হয়েছে। কত্থক জটিল ফুটওয়ার্ক এবং সুনির্দিষ্ট ছন্দময় নিদর্শন দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যা নর্তক প্রায় ১০০টি গোড়ালির ঘন্টা নিয়ন্ত্রণ করে উচ্চারণ করে। এটি জীবন থেকে এর গতিবিধি নেয়, তাদের স্টাইলাইজ করে এবং গতিবিধি নেয়, এবং জটিল ছন্দবদ্ধ নিদর্শন যোগ করে। কত্থক পুরুষ ও মহিলা উভয়ের দ্বারাই নৃত্য হয়।

কথাকলি : হল ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের একটি অন্যতম প্রধান ধারা। এতে এক প্রকার গল্প বলা হয়ে থাকে, যেখানে প্রথাগতভাবে অভিনেতা- নৃত্যশিল্পীরা বিভিন্ন রঙের রূপসজ্জা,

পোশাক ও মুখোশ পরেন। এটি ভারতের মালয়ালম ভাষী দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের (কেরালা) হিন্দু প্রদর্শন কলা। কথাকলির প্রথাগত বিষয়বস্তু হল হিন্দু মহাকাব্য ও পুরাণে বর্ণিত লোক পৌরাণিক গল্প, ধর্মীয় কিংবদন্তি, ও আধ্যাত্মিক ধারনা। নৃত্যের সাথে পরিবেশিত গান সংস্কৃত মালয়ালম ভাষায় গাওয়া হয়ে থাকে। আধুনিক রীতিতে ভারতীয় কথাকলি দলে নারী শিল্পীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এবং পশ্চিমা গল্প, যেমন উইলিয়াম শেকসপিয়রের নাটক, উপযোগ করা হয়ে থাকে।

মণিপুরি:- মনিপুরি নৃত্য যা জাগই নামেও পরিচিত, নৃত্যশৈলীর একটি প্রাচীন ধারা। এর উৎপত্তি মণিপুরে। মণিপুরের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। এই নৃত্যকে মনিপুরের সুপ্রাচীন নৃত্যধারা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি মূলত একটি নৃত্য উৎসব হিসাবে মনিপুরে পালিত হয়। এটি ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের একটি অন্যতম প্রধান ধারা। এই নৃত্য মনিপুরের সুপ্রাচীন নৃত্যধারা। মনিপুরি লাই শব্দের অর্থ হলো- দেবতা, হারাউবা, শব্দের অর্থ হলো আনন্দ-নৃত্য।

কুচিপুড়ি:- ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যের প্রধান আটটি নৃত্যশৈলীর একটি দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের কুচিপুড়ি গ্রামে এই নাচের উৎপত্তি। এর পোশাক ও আদবকায়দার সঙ্গে ভরতনাট্যমের কিছু মিল আছে। কুচিপুড়ি এক ধরনের নৃত্যনাট্য। প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃত ভাষার নাট্য শাস্ত্র পুঁথিতে এর উল্লেখ রয়েছে। চারণ কবি, উপসনালয় ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের সাথে জড়িত এই নৃত্য ভারতের অন্যান্য প্রধান শাস্ত্রীয় নৃত্যের মত ধর্মীয় শিল্পের কপারে খোদাই করার চিত্র থেকে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর পুথি মাচুপাল্লি কাইফাত থেকে কুচিপুড়ির অস্তিত্বের প্রমাণাদি পাওয়া যায়। এটি তামিলনাড়ু তে প্রাপ্ত ভগবত মেলার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

ওড়িশি:- পূর্ব ভারতের ওড়িশা রাজ্যের একটি শাস্ত্রীয় নৃত্যশৈলী। এটি ভারতের আটটি ধ্রুপদী নৃত্যশৈলীরও অন্যতম। ভারতীয় নৃত্যের আদিগ্রন্থ নাট্যশাস্ত্র এই নৃত্যশৈলীটিকে ওড্র-মাগধী নামে অভিহিত করছে। ভুবনেশ্বরের নিকটস্থ উদয়গিরি পর্বতে প্রাপ্ত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে নির্মিত একটি খোদাইচিত্র থেকে এই নৃত্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। অনুমিত হয় ব্রিটিশ আমলে এই নৃত্যশৈলীটি কিছুটা অবদমিত হয়েছিল; কিন্তু স্বাধীনতার পর আবার এর পুনরুজ্জীবন ঘটে। ওড়িশি নৃত্যে ত্রিভঙ্গি এবং চৌকা এই দুয়ের উপর অতিরিক্ত গুরুত্বারোপ ওড়িশিকে অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্যশৈলী থেকে পৃথক করেছে।

গল্প

কালুয়া ডোমের জীবন কাহিনি

গনেশ বাদ্যকর
(প্রথম বর্ষ, দর্শন বিভাগ)

গ্রামের শেষে আছে এক বিশাল প্রান্তরের মাঠ যার দিনের বেলায় এপার থেকে ওপার পর্যন্ত ভাল করে দেখা যায় না। মাঠের উত্তর পূর্ব কোণে আছে এক বিশাল বটগাছ আর এই বটগাছের সামনেই শ্মশান, আশে পাশের প্রায় দশ বারোটা গ্রাম থেকে লোক মৃতদেহ বয়ে আনে এই শ্মশানে দাহ করতে। শ্মশানের পাশ দিয়ে দুটি রাস্তা চলে গেছে একটি শহরের দিকে অন্যটি গ্রামের দিকে। শ্মশানের থেকেই কিছুটা দূরে রয়েছে একটি ছোট্ট কুটির আর ওই কুটিরেই কালুয়া ডোমের বাস। তার স্ত্রী গত হয়েছেন বছর খানেক আগেই। এখন শুধু তিনি এবং তার একমাত্র পুত্র ভৈরবকে নিয়ে তার ছোট সংসার। কালুয়া ডোম নিজেকে প্রায় ৫৪ বছর ধরে যুক্ত রেখেছেন এই শ্মশানের মড়া পোড়ানোর কাজে। অন্য দিকে তার পুত্র ভৈরব মোটেও তার মত নয়। লোকমুখে শোনা যায় ভূতে তার নাকি বেজায় ভয়। ভূতের ভয়ে কয়েকবার ভিরমিও খেয়েছে সে। তাই যখন তাকে ঘরে একা থাকতে হয়। ঈশ্বরের নাম জপ করাই তার বোধ হয় একমাত্র ভরসা আর কিছুই নয়।

একদিন সকালবেলা বাপ-বেটা গল্প করছে। এমন সময় কালুয়া বলে–

-বাবা এবার তো সব কাজ বুঝে নে, আমার তো বয়স হচ্ছে।

-বাবা আমার এই সব কাজ করতে ভালো লাগে না। বাবা তুমি যে এই সব কাজ করো তোমার ভয় লাগে না?

কালুয়া নিজের হাতের দিকে ইসারা করিয়ে দেখিয়ে দেয়– দেখ ভৈরব।

-এত বড়ো কাটা দাগ কি করে হয়েছিল বাবা ?

-ঐ দাগ নিজে নিজে করতে হয়রে, এর ভেতরে আছে শিকড়, ওই শিকড় থাকলে কোনো অশুভ শক্তি স্পর্শ করতে পারে না। যদি মরার পর এই শিকড় বার করা না হয় দেহ আগুনে পুড়বে না, মাটিতে নষ্ট করতে পারবে না।

-না বাবা আমি এই সব করবো না। আমি শহরে গিয়ে কাজ করবো।

-না না বাবা এটাই আমাদের কাজ। আমরা যদি এ কাজ না করি এ সমাজ আমাদেরকে বাঁচতে দেবেনা রে।

ভৈরব কাঁদতে কাঁদতে বাইরে চলে যায়। সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে যায় তাও ভৈরব ফেরে না। ছেলের চিন্তায় কালুয়া মরিয়া হয়ে যায়। দুপুর গড়িয়ে সন্ধের সময় ভৈরব ফিরে আসে। ফিরে এসে তার বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলে, বাবা মায়ের অবাধ্য হয়ে কোনো দিন সুখী হওয়া যায় না। তুমি যা বলবে আমি করবো।

কালুয়া বলে বাছা তুই যাতে খুশি থাকিস তাই করবি।

ভৈরব বলে সত্যি বলছো ? ভৈরব করুণ সুরে বলে কিন্তু বাবা তোমার কী হবে ?

তখন কালুয়া ডোম হেসে বলে, আরে খোকা আমার জীবন তো তিন কালে গিয়ে এককালে ঠিকেছে। আমি আর ক'দিনই বা বাঁচবো। কালুয়া বলে আয় বাছা আগে কিছু খেয়ে নে তারপর দেখা যাবে 'খন।

খেয়ে দেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর কালুয়া, কয়েকটি রুটি ছিল সেগুলিই পুটলিতে বেঁধে দিয়ে

বলল- বাছা, রাত্রির অন্ধকারে বেরিয়ে যা, নইলে কেউ দেখে ফেললে আমাদের বাঁচতে দেবে না। আমরা নিচু জাত, আমাদের শহরে গিয়ে কাজ করার অধিকার নেই।

ঠিক আছে বাবা, তোমার খেয়াল রেখো বলে ভৈরব বেরিয়ে যায়।

চারদিকে ঘন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ভৈরব ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। কালুয়ার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। সারারাত ছেলের চিন্তায় ঘুম আসে না। কয়েক দিন এভাবেই চলল, খাওয়া নেই। শুধু ছেলের চিন্তায় মনমরা হয়ে বসে থাকে সারাদিন। প্রায় এক সপ্তাহ পর গ্রামের মড়ল ও কয়েকজন গ্রামবাসী আসে কালুয়ার ঘর কালুয়াকে ডেকে বলে তোর ছেলেকে দেখছিনা, কোথায় গেছে ?

- আজ্ঞে বাবু শহরে।

- কেনো রে ?

- বাবু কাজের সন্ধানে।

–মড়া পোড়ানো কী কাজ নয় ? তোর ছেলেকে ফিরিয়ে আন।

– তা বাবু আর পারবো না।

–তুই আজ আছিস কাল নেই তখন কী হবে ? আমরা নতুন ডোম এনেছি। তুই তোর সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে যা। এখন থেকে হরিচরণ আমাদের নতুন ডোম।

–তাহলে বাবু আমি কোথায় যাব ?

–কোনো গাছ তলায়।

কালুয়াকে ঘর থেকে বের করে দেয়। সে বট গাছের তলায় বসে ভাবতে থাকে, এতদিন যাদের জন্য জীবনভর কাজ করে গেলাম তারাই আমাকে আজ ..... । দু-তিন দিন যাবৎ সে কিছুই খায়না। দুপুরে জল জল করে চিৎকার করতে থাকে।

হরিচরণ শুনতে পেয়ে দৌড়ে যেয়ে বলে আর জল খেয়ে কাজ নেই, আমি বরং গ্রামের লোকজনকে খবর দিই। গ্রামের লোকজন এসে কালুয়ার দেহ সৎকার করার জন্য আগুনে দেয়। কিন্তু আগুনে পোড়েনা। শেষে মড়লের পরামর্শে কবর দেওয়া হল।

বেশ কিছু দিন পর দেখা যায় কবরের পাশে হরিচরনের মৃতদেহ, কেউ যেন খুবলে তার মাংস খেয়েছে। পরপর এমনই ঘটনা ঘটতে থাকে। গ্রামে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে যায়, সন্ধ্যের পর বাড়ির বাইরে কেউ যায় না। গ্রামের লোকজন তান্ত্রিকের কাছে যায় কিন্তু কোনো কাজ হয় না। এরপর থেকে গোরু ছাগল শ্মশানে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। একদিন মড়লের গরু ফিরে এল না, সে ভাবল আর ফিরবে না। কিন্তু সকালে রবি খবর নিয়ে এল শ্মশানের পাশে মড়লের গরু বাধা আছে। সবাই ছুটে চলে শ্মশানের কুটিরে। দেখল এক তান্ত্রিক বসে।

সবাই জিজ্ঞাসা করল, বাবা আপনার কিছু হয়নি।

–আমার আবার কী হবে ?

সবার মনে আশা জাগল পুরো ঘটনা খুলে বলল।

বাবা বললেন, একটা কোদাল দিয়ে যাস।

সেই রাতে রুদ্রাক্ষের মালা, লাল বস্ত্র সব পরিত্যাগ করল। পরনে ধুতি। হাত চিরে তাতে একটি শিকড় রেখে সেলাই করল, কোদাল হাতে চলল সেই কবরের দিকে। চারিপাশ ভূতড়ে হয়ে গেল, দমকা বাতাস, শিয়ালের ডাক। কবরের কাছে এসে কবর খুড়তে লাগল, চারপাশ থেকে শব্দ ভেসে আসে, ছাড়বনা তোকে, কে তুই। কবর খোঁড়া হয়ে গেলে কালুয়া ডোমের হাত থেকে শিকড় বের করে দেয় এবং চেঁচিয়ে বলে, আমি ভৈরব বাবা আমি ভৈরব। চারিপাশ শান্ত হয়ে যায় সাথে কান্নার শব্দ ভেসে আসে ....

Essay

Clarity of Thoughts in Human Life

Arnab Pal

A father said to his son, "Here is a painting, your grandfather gave me. It is almost two hundred years old. Before I give it to you, go to such a person who knows the value of this painting and tell them you want to sell it. Notice how much are they willing to offer you." The son went to many such persons and came back to his father and said, "They are willing to offer Rs. 400 because it is so old".

The father said, "Well try the painting house". The son went to the painting house, came back to his father and said, "The painting house owner is willing to offer only Rs. 200 as the painting is hazy".

The father, then, asked his son to go to the museum authority and show them the painting. The son questioned his father's judgment, but still went on to act on his last wishes. After coming back from the museum, he said to his father, "The curator is willing to offer five lakhs rupees for the painting. He gave two reasons. First, it is a rare piece of painting which can be included in their precious antique collections. Secondly, it is a painting made by the famous painter Pablo Picasso".

The father responded, "I wanted to show you that the right place will value you in the right way. Don't find yourself in a wrong place and get angry because you are not being valued. Never stay in a place where someone doesn't see your worth or you don't feel appreciated. If you don't know your value, you will always settle for less than you deserve. People who don't know their value, settle for less than their worth in relationships, or in their friendships or in any other places where they are engaged".

They know they are worth more but they settle for someone else's definition of their worth. This is the difference between most people and achievers. This is the difference between people who love the life they have created for themselves and those who can't stand the life they are living. People must know their value. Most people will allow anyone to influence their perception of themselves, but people who love their life refuse to be put in a box. They will not be defined by anyone but themselves. They know their importance is set by themselves, by their own thoughts, about who they are and not someone else's opinion of what they are worth. Don't let

them put a price on you. You set your own price. So don't go giving discount to other people.

People pleasers never end up happy in the end. Put yourself first. You must build your self-worth by the work you do every day, you build it by the way that you show up every single day. Day in, day out no excuse, no shortcuts just a relentless dedication to be the best that you can be. If you have someone in your life that tries to diminish your abilities in any way, the time has come to remove them. It's time to awaken that part of you that demands more from your life. Because only you know what you are truly capable of. It's the time to wake up and shock the world. Shock those who doubted you with a commitment to excellence that cannot be matched by those of weak hearts. Shock those who doubted you with the actions you take today. Draw a line in the strand and commit to becoming the person " NO ONE" thought you could be, because only you know what you are truly capable of.

In this world you only have to earn the respect of one person and that person is " YOU". You determine the level you demanded of yourself. It's the time to demand more. It's time to prove once and for all who you are, who you will become and what you will never settle for again. Raise your standard, rise up to a higher level and let no one question your integrity again. Day by day brick by brick you start now. You build the foundation through the self-work you put in every single day. Build yourself up. Become an unbreakable force and an unstoppable machine fuelled by the results you get from the work you put in today and every day. From this day until your last day, no more will you settle for someone else's opinion of your value. Now you determine your values through your self-work, your self-education, your self-determination for your own destiny. The destiny that is in your hands. Your pride grows stronger every day from the work you put in the time for change. When it comes to your own self-worth there is no tomorrow know your worth and never ever settle for anything less. So be focused to make yourself.

AROGYAM
Menstrual Hygiene Day
GPS Map Camera
Bhairabpur, West Bengal, India
C426+H4, Bhairabpur, West Bengal 722133, India
Lat 23.401364°
Long 87.110247°
28/05/23 09:43 AM GMT +05:30

Maraya, West Bengal, India
C33W+FHC, Maraya, West Bengal 722133, India
Lat N 23° 24' 11.6388"
Long E 87° 5' 45.3372"
29/12/22 11:31 AM

Bankura, West Bengal, India
C443+PV6, Gangdua Dam Rd, West Bengal 722133, India
Lat 23.406887°
Long 87.104447°
29/12/22 03:28 PM

ANANDAM
Bankura, West Bengal, India
C443+VQ2 Gobinda Prasad College, West Bengal 722
Lat 23.407143°
Long 87.104094°
23/02/23 11:24 AM

GOBINDA PRASAD MAHAVIDYALAYA

Printed at : **Shamayita Press, Ranbahal, Amarkanan, Bankura, Ph-6294716665**